বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক, ১৯৭২-২০০৭ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের শর্তাবলীর অংশবিশেষ পূরণের নিমিত্তে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ শিহাব উদ্দীন
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ
আগষ্ট,২০১৩।

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, জনাব মোঃ শিহাব উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের (২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের) একজন নিয়মিত এম.ফিল গবেষক। তাঁর রেজিষ্ট্রেশন নং ৫০। তিনি আমার তত্ত্ববধানে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরনকরত: "বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক, ১৯৭২-২০০৭ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক মৌলিক গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন। আমার জানামতে উক্ত শিরোনামে ইতোপূর্বে কোন মৌলিক গবেষণা কর্ম সম্পন্ন হয়নি।

জনাব মোঃ শিহাব উদ্দীন এ গবেষণা কর্ম বা থিসিসটি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপন করেন নি। আমি তাঁর থিসিসের প্রতিটি অধ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি এবং থিসিসটি ইতিহাসে এম.ফিল.ডিগ্রী প্রদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ড.সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০।

গবেষকের ঘোষণাপত্র

আমি মোঃ শিহাব উদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষাবর্ষের একজন পূর্ণকালীন এম.ফিল. গবেষক। আমার রেজিস্ট্রেশন নং ৫০। আমার গবেষণার শিরোনাম হলো "বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক, ১৯৭২-২০০৭ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ"। ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী আমার সম্মানিত গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক। ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত এ গবেষণা কর্মটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণা। এ থিসিসের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন বা প্রকাশিত হয়নি। থিসিসের অংশবিশেষ বা কোন অধ্যায় ইতোপূর্বে কোথায়ও প্রদর্শিত হয়নি।

মোঃ শিহাব উদ্দীন
এম.ফিল.গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,
ঢাকা-১০০০।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

"বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক, ১৯৭২-২০০৭ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পকে থিসিস আকারে গড়ে তুলতে আমাকে সক্ষমতা দানের জন্য আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাগতিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রথমেই আমার গবেষণা তত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণার সুদীর্ঘ কয়েকটি বছর তিনি নিরলসভাবে আমার গবেষণাকর্মের খুটি নাটি বিষয় পর্যন্ত বিস্তারিত দেখেছেন, সংশোধন করেছেন, সঠিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরন করার দিক নির্দেশনা দান করেছেন এবং আমার থিসিস লিখতে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া ঢাকায় কোরীয় দূতাবাসে অবস্থিত KOICA অফিস, কোরিয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সাভারে অবস্থিত KDAB নামক এন.জিও এবং বাংলাদেশে অবস্থিত কোরীয় EPZ বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকায় আমাকে তথ্য ও উপাত্তসংগ্রহ করার পদ্ধতি ও দিক নির্দেশনা দান করেছেন। আমি ম্যাডামকে এসব কিছুর জন্য পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের আরো কতিপয় শিক্ষক মন্ডলীর কাছেও আমার এ থিসিস লেখার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছি। তারা হলেন যথাক্রমে- প্রফেসর ড. শরিফ উদ্দিন আহমদ, প্রফেসর ড. আহমেদ কামাল, প্রফেসর ড. নূরুল হুদা আবুল মনসুর, প্রফেসর ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং ড. আশফাক হোসেন প্রমূখ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড.এ.এফ.এম. শামসুর রহমান সুদীর্ঘদিন যাবৎ দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্বিবিদ্যালয়ে গবেষক ও ভিজিটিং প্রফেসর থাকাকালীন কোরিয়ার Political Economy-র ওপর অসংখ্য বই পুস্তক এবং মৌলিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশে এনেছেন। তিনি তার এই সুবিশাল সংগ্রহশালা আমার গবেষণার জন্য ব্যবহার করতে অনুমতি দান করেন। তা না হলে বাংলাদেশে অবস্থান করত:কোরিয়ার ওপর এ গবেষণাকর্ম লেখা সম্ভব হতো না। আমি এ কোরিয়া বিশেষজ্ঞের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

উপরোক্ত একাডেমিক ও গবেষণা বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত আমার পরিবারের কয়েকজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তারা হলেন আমার বাবা মোঃ জাফর আলী, মা মোসাম্মাৎ আমিনা খাতুন, বড় বোন ড. রুনালাইলা, ছোট বোন লিপি, এবং ছোট ভাই দুলু। আমার খালাতো ভাই আবুল মঞ্জুর এবং বাচ্চু ধন্যবাদ পাবার দাবি রাখে। আমার স্ত্রী পপি আমাকে সবসময় থিসিস লেখার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের সবাইর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ দান করছি। প্রতিবেশী রিয়াজ এবং সহকর্মী নাসির ভাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, আমি ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেসব লাইব্রেরী ও নথিশালা ব্যবহার করেছি সেসব গ্রন্থাগার ও নথিশালার গ্রন্থগারিক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা দান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী রেজিস্ট্রার শেখ মোঃ জামাল ভাইকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থিসিসটি অনেক ধৈর্য্যসহকারে কম্পিউটার কম্পোজ এবং বাঁধাই করেছেন মোঃ বেলাল আহমেদ। আমি তাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তবে মুদ্রণ প্রমাদ ও অন্যান্য সকল ত্রুটির দায়িত্ব আমার নিজের।

পরিশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আরেকবার শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

খোদা হাফেজ

মোঃ শিহাব উদ্দীন।

সংক্ষিপ্তসার

বিসমিল্লাহ্ হির রাহমানির রাহিম

"বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক, ১৯৭২-২০০৭ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ" শীর্ষক বর্তমান এম.ফিল থিসিসে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া বা প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার (ROK) সাহায্য ও সহযোগিতার বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করে একুশ শতকের শুরুতে সমগ্র বিশ্বে একদিকে যেমন শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীন সম্পদের পুরোপুরি ব্যবহার করা ছাড়াও বাইরের শিল্পোন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক বিশ শতকের শেষভাগ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা দান এ প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ। তবে অন্যান্য পুঁজিবাদী ও বড় বড় সামরিক শক্তি অধ্যূষিত দেশগুলো থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক সহায়তার পার্থক্য এই যে, এ দু'টি দেশ শুধুমাত্র ব্যবসায়ের খাতিরে ব্যবসা করে, সাহায্য দানের নেপথ্যে তাদের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক অভিপ্রায় বা অভিলাষ নেই। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিভিন্নখাতের উন্নয়নের জন্য এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে এবং সহজশর্তে অর্থনৈতিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া অনুকূল শর্তে স্বাগতিক দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা, শ্রমশক্তি আমদানি করা, এনজিও ভিত্তিক প্রকল্প পরিচালনা করা এবং সাংস্কৃতিক লেনদেনমূলক তৎপরতা চালাবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে কোরিয়া বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের বিস্তার রোধে বিশ্বস্ত মার্কিন সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং এর দ্বারা কোরিয়ার অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতিতে এমন আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয় যার ফলশ্রুতি হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার পুঁজি সংগ্রহ ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। তবে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হবার পর অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের পর থেকে সারা বিশ্বে সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় শিল্প-কারখানা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথ দ্রুততর হয় এবং নিজস্ব অর্থনীতির অধিক বিকাশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। এখন থেকে কোরিয়ার নিজস্ব পদ্ধতিতে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য খাতগুলো আরো সুস্পষ্টরূপ ধারণ করে। ফলে কোরিয়ার পক্ষ

থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করে তোলার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। একুশ শতকের শুরুতেই দক্ষিণ কোরিয়া এর অসাধারণ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সংস্থা G-8 এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দেশটির মাথাপিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঠিক এই পটভূমিকায় বাংলাদেশের সাথে ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক জোরদার হয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্র বহুমূখী রূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য ১৯৮০-র দশক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতা দান করতে শুরু করে।

মোট ৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত বর্তমান গবেষণাকর্মে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার সরকারি ঋণ সহায়তা, অনুদান সহায়তা, বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন এলাকা স্থাপন, বাংলাদেশ থেকে কোরিয়ায় শ্রমশক্তি আমদানি ও ব্যবহার, প্রযুক্তিগত সহায়তা, বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলোর ওপর প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎসের সহযোগে আলোকপাত করা হয়েছে। এ থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কিভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে তার ওপর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা।

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নম্বর
প্রত্যয়ন পত্র	ঃ	I
ঘোষণাপত্র	ঃ	II
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ	III
সংক্ষিপ্ত সার	ঃ	IV-V
সূচিপত্র	ঃ	VI
ভূমিকা	ঃ	০১-২৮
প্রথম অধ্যায়ঃ		
বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সাহায্য (ODA), ১৯৮৭-২০০৭	ঃ	২৯-৪৪
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ		
বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ১৯৭৩-২০০৭	ঃ	৪৫-৬০
তৃতীয় অধ্যায়ঃ		
বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ, ১৯৮৭-২০০৭	ঃ	৬১-৭৬
চতুর্থ অধ্যায়ঃ		
বাংলাদেশে কোরীয় ই.পি.জেড. স্থাপন ১৯৯৫- ২০০৭	ঃ	৭৭-১০৬
পঞ্চম অধ্যায়ঃ		
Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং বাংলাদেশে এর অনুদান ভিত্তিক সাহায্য তৎপরতা, ১৯৯১-২০০৭	ঃ	১০৭-১৪০
ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ		
দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি, ১৯৮৭-২০০৭	ঃ	১৪১-১৬২
উপসংহার	ঃ	১৬৩-১৮০
গ্রন্থপঞ্জী	ঃ	১৮১-১৯১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক, ১৯৭২-২০০৭ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ

মোঃ শিহাব উদ্দীন
শিক্ষা বর্ষঃ ২০০৮-২০০৯
রেজিঃ নম্বর ঃ ৫০
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

"বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্ক, ১৯৭২-২০০৭ঃ একটি ঐতিহাসিক বিশেষণ" শীর্ষক বর্তমান এম.ফিল থিসিসে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষিণ কোরিয়া বা প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার (ROK) সাহায্য ও সহযোগিতার বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে, বিশেষ করে একুশ শতকের শুরুতে সমগ্র বিশ্বে একদিকে যেমন শিল্পোন্নত পূঁজিবাদী দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীন সম্পদের পুরোপুরি ব্যবহার করা ছাড়াও বাইরের শিল্পোন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক বিশ শতকের শেষভাগ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার বিশাল জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা দান এ প্রক্রিয়ারই অংশবিশেষ। তবে অন্যান্য পূঁজিবাদী ও বড় বড় সামরিক শক্তি অধ্যূষিত দেশগুলো থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের অর্থনৈতিক সহায়তার পার্থক্য এই যে, এ দু'টি দেশ শুধুমাত্র ব্যবসায়ের খাতিরে ব্যবসা করে, সাহায্য দানের নেপথ্যে তাদের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক অভিপ্রায় বা অভিলাষ নেই। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিভিন্নখাতের উন্নয়নের জন্য এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে এবং সহজশর্তে অর্থনৈতিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া অনুকূল শর্তে স্বাগতিক দেশে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা, শ্রমশক্তি আমদানি করা, এনজিও ভিত্তিক প্রকল্প পরিচালনা করা এবং সাংস্কৃতিক লেনদেনমূলক তৎপরতা চালাবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে কোরিয়া বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের বিস্তার রোধে বিশ্বস্ত মার্কিন সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং এর দ্বারা কোরিয়ার অভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতিতে এমন আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয় যার ফলশ্রুতি হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার পূঁজি সংগ্রহ ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। তবে স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হবার পর অর্থাৎ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের পর থেকে সারা বিশ্বে সামরিক উত্তেজনা প্রশমনের ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় শিল্প-কারখানা ভিত্তিক পূঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পথ দ্রুততর হয় এবং নিজস্ব অর্থনীতির অধিক বিকাশের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে। এখন থেকে কোরিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব পদ্ধতিতে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য খাতগুলো আরো সুস্পষ্টরূপ ধারণ করে। ফলে কোরিয়ার পক্ষ থেকে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করে তোলার প্রচেষ্টা গৃহীত হয়। একুশ শতকের শুরুতেই দক্ষিণ কোরিয়া এর অসাধারণ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সংস্থা G-8 এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দেশটির মাথাপিছু আয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঠিক এই পটভূমিকায় বাংলাদেশের সাথে ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্ক জোরদার হয় এবং সম্পর্কের ক্ষেত্র বহুমূখী রূপ পরিগ্রহ করে। অবশ্য ১৯৮০-র দশক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতা দান করতে শুরু করে।

মোট ৬ টি অধ্যায়ে বিভক্ত বর্তমান গবেষণাকর্মে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার সরকারি ঋণ সহায়তা, অনুদান সহায়তা, বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন এলাকা স্থাপন, বাংলাদেশ থেকে কোরিয়ায় শ্রমশক্তি আমদানি ও ব্যবহার, প্রযুক্তিগত সহায়তা, বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলোর ওপর প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎসের সহযোগে আলোকপাত করা হয়েছে। এ থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কিভাবে শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে তার ওপর বিশেষণাত্মক আলোচনা করা।

ভূমিকা

স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা সমকালীন কূটনীতির একটি অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক অঙ্গনের বাইরেও এ সহযোগিতা অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও কারিগরি ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করে চলেছে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক এ ধরণের এমন একটি বিষয় যা স্নায়ুযুদ্ধের সময় শুরু হয়েছে এবং স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে তা উত্তরোত্তর জোরদার হয়ে উঠেছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালের মে মাসে কোরিয়া প্রজাতন্ত্র বা দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দান করে এবং ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে এর কূটনৈতিক মিশন স্থাপন করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিউলে এর দূতাবাস স্থাপন করে।

মূলত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্বস্ত ও অনুগত মিত্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দক্ষিণ কোরিয়া অত্যন্ত নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তবে ১৯৬০ এর দশকের শেষ ভাগ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে কাঁচামাল ক্রয় ও শিল্পজাত সামগ্রী বিক্রয়ের বাজার স্থাপনের প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের প্রতি সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করে। এভাবে উভয় দেশের মধ্যে পারস্পারিকভাবে লাভজনক সহযোগিতা গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো হলো বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সাহায্য কর্মসূচি (Official Development Assistance বা ODA), দক্ষিণ কোরিয়ার কারিগরি সহযোগিতা, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিময়, দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্প কারখানায় বাংলাদেশের জনশক্তির ব্যবহার এবং বাংলাদেশের শিল্পখাতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ প্রভৃতি।

সমকালীন বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ কেরিয়া একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি। অন্যদিকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়া সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে সব উপাদান বিবেচনায় আসে সে গুলো হচ্ছে ভৌগলিক ও সামরিক স্বার্থ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক বিনিময় ভাষা ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার। বিভিন্নক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের বিস্তর ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাব বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ কেরিয়া বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। এ দু'দেশের সম্পর্ক ও সহযেগিতা পারস্পরিক স্বার্থ, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের ধারাবাহিকতায় বিকাশমান। এ সম্পর্কের

ক্ষেত্রে সমস্যা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সম্পর্ক বিকাশের বাস্তব সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া পারস্পারিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও উভয় দেশের সম্পর্ক যেভাবে বিকাশলাভ করেছে তার নিবিড় অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়া মহাদেশের দু'টি দেশ। আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় দিক থেকেই বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে ছোট। তবে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই দুই দেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য এক সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এ সম্পর্ক প্রতিরক্ষা, ব্যবসা বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রকেও প্রভাবিত করছে। দক্ষিণ কোরিয়ার অবকাঠামো নির্মাণ, সেবাখাত, ম্যানুফাকচারিং এবং কৃষি ও মৎস্য খাতে কাজ করার জন্য প্রতিবছর বাংলাদেশ উল্ল্যেখযোগ্য পরিমান জনশক্তি দক্ষিণ কোরিয়ায় রপ্তানি করে থাকে।[১,২] খেলাধুলার উন্নয়নে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যার ফলে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। এছাড়া কোরীয় এথলেট বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের এথলেটদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য নানারকম প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দল প্রেরণের মাধ্যমে ক্রীড়া খাতকে আরও শ্রীবৃদ্ধি দান করে চলেছে।[৩]

সামরিক খাতেও বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে যৌথ সামরিক মহড়া, প্রশিক্ষণ বিশেষ ইউনিট কর্তৃক সাবমেরিন নির্মাণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো গতিশীল করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকে সাবমেরিন ULSAN ক্রয় এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে নতুন রূপ প্রদান করেছে।

ভৌগলিক অবস্থান

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম জনবসতিপূর্ন একটি দেশ। দেশটির সরকারি নাম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" (Gono Projatontri Bangladesh) বা Peoples Republic of Bangladesh. রাজধানী ঢাকা। রাষ্ট্রভাষা বাংলা। ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৫,৫৯৯ বর্গমাইল আয়তনের এ দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি ৪২ লক্ষ, (সূত্রঃ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৯)। ২০"৩৪° উত্তর হতে ২৬"৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮"০১° পূর্ব হতে ৯২"৪১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে বাংলাদেশ অবস্থিত। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এর উত্তরে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ,

আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মায়ানমার অবস্থিত। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত।[৪]

বঙ্গোপসাগর তথা ভারত মহাসাগরের মূখে বাংলাদেশের অবস্থান। এ হেতু চীন থেকে এটি তিব্বত দ্বারা বিচ্ছিন্ন। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া পূর্ব এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। দেশটির সরকারি নাম Republic of Korea বা প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া (ROK), (Rok, Hangul: Hanja: Pronounced [tɛ:hanminguk])।[৫] সাধারণভাবে এ দেশটি South Korea বা দক্ষিণ কোরিয়া নামে পরিচিত এবং তা কোরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত। এর পূর্বে জাপান, উত্তরে উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণে পূর্ব চীন সাগর ও তাইওয়ান অবস্থিত। দক্ষিণ কোরিয়ার আবহাওয়া আর্দ্রভাবাপন্ন এবং পার্বত্যাঞ্চলের আর্দ্র জলবায়ু এখানে বিরাজ করে। দেশটির মোট আয়তন ৯৯,৩৯২ বর্গকিলোমিটার।[৬] লোকসংখ্যা প্রায় ৫০ মিলিয়ন। দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল এবং প্রায় ১০,৪২১,৭৮২ জন লোক এ শহরে বসবাস করে।

অপর দিকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে বিকাশমান দেশগুলোর অন্যতম। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী জাপান, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থান এ অঞ্চলে। এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অস্ত্র উৎপাদন ও আমদানির মাত্রা বৃদ্ধি করে চলেছে। এ অঞ্চলে নিয়োজিত মার্কিন নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন জোসেফ মরগানের মতে, স্নায়ূযুদ্ধের অবসান ও সোভিয়েত সামরিক শক্তি উপস্থিতি হ্রাসের ফলে এ অঞ্চলে যে শক্তি শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণের জন্য বিশ্বের প্রধান শক্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন প্রভৃতি দেশ যেমন দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে তেমনি এ অঞ্চলের আঞ্চলিক শক্তিবর্গ চীন, ভিয়েতনাম, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাঝে তীব্র প্রতিযেগিতার সৃষ্টি হয়েছে।[৭]

যে কোন দেশের পরাষ্ট্রনীতির প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। বাংলাদেশ ও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের আয়তন, জনসংখ্যা, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভৃতি বিবেচনা করে পররাষ্ট্রনীতির এমন কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা কখনোই পরিবর্তনযোগ্য নয়। আবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতিপয় পরিবর্তনশীল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা শাসন ক্ষমতা পরিবর্তনের সাথে সাথে পররাষ্ট্রনীতিতে যুক্ত হয়।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দেশ। মৌসুমী জলবায়ু ও এদেশের ভৌগলিক অবস্থান পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম নির্ধারক উপাদান। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ

নয় বলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পুরোপুরি কার্যকর নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অনেকাংশে সুবিধাবাদী প্রকৃতির। বিশেষ করে, পরিস্থিতির সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সমন্বয় করে নিতে হয়। অর্থাৎ অনেক সময় পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের সামর্থ্যের বাইরে থাকে। এজন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিবেশী দেশ বিশেষ করে, ভারতের সাথে সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বৃহৎ শক্তিসমূহ, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রনয়নে প্রভাব বিস্তার করে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সংগঠন যেমন- জাতিসংঘ, ন্যাম, ওআইসি , সার্ক প্রভৃতির সাথে সম্পর্ক বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির বিশেষ দিক। এমন অনেক সংস্থা আছে যেগুলো পরীক্ষামূলকভাবে তাদের কূটনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রাচ্যের দেশগুলো, বিশেষ করে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, জাপানের সাথে সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। একই সাথে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ বিভিন্ন দেশ, যেমন- ইরাক, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, মিশর, লেবানন, জর্দান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সাথে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া এযাবৎকালের মধ্যে বিশ্বের প্রায় ১৮৮টি দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের মত দেশটির সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ দেশটি ১৯৪৫ সালের ২৭ নভেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এবং মূলত: তখন থেকেই জাতিসংঘে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৮৮ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের আয়োজন করে এবং ২০০২ সালে জাপানের সাথে যৌথভাবে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করে। বাংলাদেশের মত দক্ষিণ কোরিয়াও জাতিসংঘ, WTO, OECD, ASEAN, Plus Three, East Asia Summit (EAS), G-20-এর সদস্য। এছাড়াও দেশটি Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) বা এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার এবং East Asia Summit এর সদস্য। এদিকে ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী Ban Ki-moon জাতিসংঘের অষ্টম মহাসচিব নির্বাচিত হন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।[৮]

বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বিরাজমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে তথ্য ও উপাত্তের সাহায্যে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

করা। এতে উভয় দেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যদিও সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রকেও আলোচনার মধ্যে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি শিল্পোন্নত শক্তি হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার উত্থান প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, বিকাশ ও পুণর্গঠন প্রক্রিয়ায় উভয় দেশ নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করে চলেছে। দক্ষিণ কোরিয়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অত্যাধুনিক সামরিক যানবাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র বা সাবমেরিন নির্মাণ করলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে এদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক সাজ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় খুব একটা বিবেচনা করা হয় না। বরং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়ায় তৈরি শিল্প-সামগ্রীর বাজার সৃষ্টি করা, নিকটবর্তী এশীয় দেশগুলো থেকে কোরিয়ার শিল্প-করখানার উৎপাদনের জন্য সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ বা আমদানি করা, কোরিয়ার পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিনিয়োগ ক্ষেত্র গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগকারীদের সব ধরণের সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করার জন্য স্বাগতিক দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক নেতারা তাদের প্রশাসনের কূটনীতিকে সর্বাপেক্ষা বাস্তবতা বা Pragmatic ধারায় পরিচালিত করেন। এসব জাতীয় উদ্দেশ্য সামনে রেখে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রত্যেক প্রশাসন তাদের সময়কালের মধ্যে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে সবচাইতে দক্ষতা সহকারে পরিচালনা করেছেন এবং কোরীয় পুঁজিপতি শ্রেনী বা সংগঠক শ্রেনীকে enterpreneurs বা চেবল্ এ রূপান্তরিত করেছেন। কোরিয়ার বর্তমান শিল্প তথা বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে উপরোক্ত business conglomerates বা চেবল্ শ্রেনীর অবদান সবচাইতে বেশি। আবার উক্ত চেবল্ শ্রেনীর উত্থান ও বিকাশে সহায়তা করেছে কোরিয়ার Developmental State বা উন্নতিকামী রাষ্ট্র যা অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এসব চেবল্ শ্রেনীকে বিভিন্ন প্রকার সুবিধা ও ছাড় প্রদানের মাধ্যমে কোরিয়ার Big-capitalism বা বড় ধরণের পুঁজিবাদকে উৎসাহিত করেছে এবং উত্তরোত্তর বিকাশলাভে সহায়তা করেছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং সাহায্যদান করার পেছনে সেদেশের উন্নতিকামী রাষ্ট্র কর্তৃক কোরীয় পুঁজিবাদের আরো অধিক বিকাশ বা সম্প্রসারণের সুপ্ত অভিলাষ নিহিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোরিয়া এর অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশে আন্তর্জাতিক উপাদানগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯১০ সালে কোরিয়ায় জাপানের ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হবার পূর্বে কোরিয়া ছিল মূলত: একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং শিল্প-কারখানা ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন একটা ছিল না। কিন্তু ১৯১০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কোরিয়ায় জাপানী শাসনামলে জাপানী অর্থনীতির সম্পূরক হিসেবে জাপান কোরিয়াকে বেছে নেয়। ১৯১৯ সালে কোরিয়াকে জাপানের একটি প্রদেশে রূপান্তরিত করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় চোজন। Government-General নামক একটি শাসন কর্তৃপক্ষ জাপানের রাজকীয় প্রশাসনের পক্ষে কোরিয়া শাসন করতো। কোরিয়ার একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকতো এবং উক্ত ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সুপারিশ মোতাবেক জাপান সরকার কোরিয়া শাসন করার জন্য বিভিন্ন প্রকার নীতি ও আইন ঘোষণা বা প্রনয়ন করতো। উল্লেখ্য যে, ১৮৬৮ সালের মেইজী রেস্টোরেশনের পর থেকে জাপানের মেইজী সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীসভা দেশে পাশ্চাত্যের অনুরূপ শিল্পায়ন, পুঁজিবাদের বিকাশ এবং অর্থনীতিকে জোরালো করে তোলার লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করে এবং চীনের নিকট থেকে কিয়ূৎকু দ্বীপপুঞ্জ, ফরমোজা (বর্তমান তাইওয়ান) এবং কোরিয়া দখল করে। পরবর্তীতে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। এসব বিজিত ও দখলীকৃত ভূখন্ডের ভূমি, কাঁচামাল, জনশক্তি, খনিজসম্পদ, কৃষিজ, বনজ ও অবকাঠামোকে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আবার জাপানের শিল্পপতিরা কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও তাইওয়ানে কৃষিখামার গড়ে তোলা, সার, বিদ্যুৎ, বস্ত্র, চিনি, রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পকারখানা স্থাপন করে এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী জাপানসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করতো। এভাবে জাপানের উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা দেশের বাইরে বিনিয়োগ করা শুরু করে এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। এর মধ্যে মিৎসুই, মিৎসুবিশি, সুমিতোমো এবং ফুজি কোম্পানির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব জাপানী কোম্পানি তথা বিনিয়োগকারীরা উপনিবেশগুলোতে তাদের ব্যবসায়- বাণিজ্যে সহায়তাকারী অসংখ্য দেশীয় দালাল বা সহযোগী ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা লাভ করে। এসময়ে বেশ কতিপয় উদীয়মান কোরীয় উদ্যোক্তা জাপানী প্রশাসন ও পুঁজিপতিদের সাথে সহযোগিতা করে লাভবান হয়েছিলেন। এদের মধ্যে সামসাং কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা লী বিয়াং-চোল, হুনদাই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী চুং জু ইয়াং এবং Doosan কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতার নাম উল্লেখযোগ্য।[৯]

জাপানী প্রশাসনামলে কোরিয়ায় অসংখ্য চাউল ছাটায়ের মেশিন, বস্ত্রকারখানা, লবণশিল্প,

সারকারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট, বৃহদায়তন কৃষিখামার স্থাপিত হয় এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজ উত্তোলনের কাজ শুরু হয়। এছাড়া কোরীয় সহযোগী শ্রেনী জাপানীদের সহায়তায় মাঞ্চুরিয়ায় ভূমির উদ্ধার ও উন্নয়ন এবং তাইওয়ানে চিনি শিল্প কারখানা স্থাপন করে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কোরিয়ায় অবস্থানরত জাপানী সৈন্যরা কোরিয়াতে ৩৮° অক্ষাংশের দক্ষিণ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করে। এভাবে কোরিয়া উপদ্বীপ দু'টি পৃথক রাজনৈতিক ভূখন্ডে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সময়ের ব্যবধানে উভয় কোরিয়ার মধ্যকার বিভক্তি স্থায়ীরূপ লাভ করে। তবে কোরিয়ার বিভক্তিকরনের ফলে জাপানী শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানা সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো উত্তর কোরিয়ার ৫১ হাজার বর্গমাইলের অন্তর্ভূক্ত হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ছিল পরোপুরিভাবে কৃষি অধ্যূষিত চাউল উৎপাদনকারী এলাকা। এমনকি এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য কোন বিদ্যুৎ প্লান্টও সেখানে ছিল না।[১০]

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন মিত্রপক্ষের সামরিক দখলাধীনে ছিল যাকে United States Army Military Government in Korea বা USAMGIK বলা হতো। USAMGIK এর সময়কালে (১৯৪৫-১৯৪৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা জাপানের ঔপনিবেশিক শাসনামলের পরিত্যক্ত অর্থনৈতিক কাঠামোকে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় স্বার্থের অনূকূলে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিকও অর্থনৈতিক দর্শন কাঠামোর সাথে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ Capitalistic Democracy বা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে ভবিষ্যতে দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদের সম্প্রসারণরোধে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের একটি শক্তিশালী মিত্রতে পরিণত হয় এবং উত্তর কোরিয়ার সামরিক হুমকিকে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৫ সালে জাপানের আত্মসমর্পনের পর উত্তর কোরিয়ায় কম্যুনিষ্ট নেতা কিম ইল-সুং-এর নেতৃত্বাধীন কোরিয়া ওয়ার্কাস পার্টি সোভিয়েত নমুনায় একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। এসময় চীনে কম্যুনিষ্ট ও কুয়োমিনতাংদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছিলো এবং পূর্ব এশিয়ার সাম্যবাদের সম্ভাব্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিক বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কর্মকর্তারা USAMGIK-এর পক্ষ থেকে কতিপয় সংস্কারমূলক

পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসময় কোরিয়ায় ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টনের জন্য ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। শ্রমিক শ্রেনীকে দক্ষ জনশক্তি ও একটি ব্যবস্থাপক শ্রেনী গড়ে তোলার জন্য মার্কিন পদ্ধতির শিক্ষাদান পদ্ধতি চালুর সুপারিশ করা হয়। তৃতীয়তঃ জাপানী শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়ীদের পরিত্যক্ত শিল্প-কারখানা, সম্পত্তি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিলামে চড়িয়ে কোরীয় উদ্যেক্তাদের নিকট কম মূল্যে ও কিস্তিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সবশেষে, কোরিয়ার শিল্প-কারখানার জন্য সুলভে কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্রদেশ গুলোর সাথে অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১১]

১৯৪৮ সালে USAMGIK-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর Republic of Korea (ROK) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ড. সীং ম্যান রী নামক আমেরিকায় শিক্ষিত জনৈক জাপান বিরোধী নেতা কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং USAMGIK-এর পক্ষ থেকে ড. সীং ম্যান রী-র নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। ড. রী ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী নেতা এবং তার দলের নাম ছিল Korea Liberal Party. কোরিয়ার আইন সভায় যার নাম ছিল National Assemly এবং এখানে লিবারাল দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ড. রী ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মুখে তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করেন যা ইতিহাসে 'এপ্রিল বিপ্লব' নামে খ্যাত।[১২]

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ড. সী ম্যান রী-র শাসনামলে কোরিয়ার অর্থনৈতিক উত্থান তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল না, যদিও এসময় দক্ষিণ কোরিয়ায় Import Substitute Industrialization বা আমদানি বিকল্প হাল্কা শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রী প্রশাসনকে বিভিন্নমুখী সহায়তা দান করে। কোরিয়ার জুতা, চামড়া, প্লাষ্টিক, বস্ত্র এবং খেলাধুলার সামগ্রী তৈরি শিল্প কারখানার কাঁচামাল মেশিন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে মার্কিন ডলারে ঋণ সহায়তা দান করা হয়। রী প্রশাসন এসব সহায়তাকে কোরীয় মালিক ও উদ্যোক্তাদের প্রচলিত বাজার মূল্যের চাইতে কমবিনিময় মূল্যে (কোরীয় ওন থেকে মার্কিন ডলার ক্রয়) মার্কিন ডলার সরবরাহ করে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে আমদানি করা তুলা ও অন্যান্য কাঁচামাল এবং যন্ত্রাংশ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আমদানি করার পর ভর্তুকির মাধ্যমে কম মূল্যে উদ্যোক্তা ও মালিকদের সরবরাহ করা হয়। আবার জাপানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিও খুবই কমমূল্যে

কোরীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদেরকে সরবরাহ করা হয়। সর্বোপরি, কোরিয়ার যুদ্ধের সময় (১৯৫০-১৯৫৩ সালে) দক্ষিণ কোরিয়ার যে ব্যাপক জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ হয় তা কাটিয়ে ওঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ত্রাণ ও অন্যান্য খাদ্যশস্য সরবরাহ করে। পি.এল-৫৮০ চুক্তির আওতায় কোরিয়ায় গম, চাউলও অন্যান্য খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্ররা কোরিয়ায় পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের স্বার্থে GSP-র আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী যেমন, জুতা. ব্যাগ, খেলার সরঞ্জাম, তৈরি পোশাক, ছাতা, প্রসাধনী ও কাঠের সামগ্রী সংশ্লিষ্ট বাজারে শুল্কমুক্তভাবে রপ্তানির অনুমতি দান করে। এটি ছিল কোরিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের মাধ্যমিক স্তর।[১৩]

কিন্তু ড. সীং ম্যান রী প্রশাসনের ব্যাপক দূর্নীতি, আত্মসাৎ ও দমননীতির ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার জনগন তাকে অপছন্দ করা শুরু করে। একজন জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তিনি কট্টর জাপান বিরোধী ও সাম্যবাদ বিরোধী ছিলেন। উত্তর কোরিয়া ও চীনের এজেন্ট সন্দেহে তাঁর প্রশাসনামলে অসংখ্য দক্ষিণ কোরীয় নাগরিক বন্দী, নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ থেকে প্রাপ্ত পুণর্গঠন সাহায্য লিবারেল দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ডলার ভর্তুকি, আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষ, উৎকোচ ও দলীয় পরিচিতি ছিল যোগ্যতার প্রধান উপকরণ। বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের কারারুদ্ধকরন, বিরোধীদলের সমর্থক ব্যবসায়ী ও উদ্যেক্তাদের সবধরণের সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা এবং ভিন্ন মতাবলম্বী বা সরকার বিরোধী সংবাদপত্র ও মতামত প্রকাশ সাম্যবাদের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে নির্মমভাবে দমন করা হতো। গণতন্ত্রের বা পুঁজিবাদের বিকাশধারা রী-র স্বৈরাচারী প্রশাসনামলে দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয় এবং খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিকাশের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও নিয়োগ বন্টনের ক্ষেত্রে আরো উদারনীতি গ্রহণের আহবান জানায়। কিন্তু রী এবং তার দলীয় নেতারা নিজেদের স্বার্থের প্রশ্নে বিরোধী দলের সাথে কোন প্রকার আপোষ করতে রাজী ছিলেন না। ফলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৯৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ড. রী-র পুন:নির্বাচনের বিরোধীতা করে এবং দেশব্যাপী প্রবল বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু করে যা ক্রমশ:উগ্র সন্ত্রাসীরূপ পরিগ্রহ করে। এমতাবস্থায় রী-র নির্ভরযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ও মিত্রদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

ডুয়াইট ডি. আইজেন হাওয়ার (১৯৫২-১৯৬০) রী-কে ক্ষমতাত্যাগ করার পরামর্শ দেন এবং এ আহবানে সাড়া দিয়ে ড. রী তার ভাইস প্রেসিডেন্ট চ্যাং মিওনের নিকট ক্ষমতা হস্তন্তর করেন এবং দেশ ত্যাগ করেন।[১৪]

দক্ষিণ কোরিয়ায় দ্রুত পুঁজিবাদ বিকাশের অধ্যায় শুরু হয় সেদেশে তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হি-র সময়ে (১৯৬৩-১৯৭৯)। দক্ষিণ কোরিয়ার পুঁজিবাদী অর্থনীতির চরম উন্নতি ও বিকাশের যুগ ছিল পার্ক চুং হি-র প্রশাসনামল। ১৯৬১ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পার্ক চুং হি তৎকালীন অন্তবর্তী প্রশাসন প্রধান প্রেসিডেন্ট চ্যাং মিওনের নিকট থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় একটি বিস্ময়কর অর্থনৈতিক বিকাশের যুগের সূচনা করেন যা কোরিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসে 'Miracle of the Han' (অর্থাৎ হান নদীর অলৌকিকতা) নামে পরিচিত।

এধরণের পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের উদ্যোগ গ্রহণের পশ্চাতে পার্ক চুং হি-র কতকগুলো কারণ দায়ী ছিল। প্রথমত: কোরিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি ছিলেন একজন আগন্তুক। তার পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পরিচিতি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল না। দ্বিতীয়ত: তিনি জাপানী ঔপনিবেশিক শাসনামলে কোরিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর কোনটিতেই অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না, বরং তিনি জাপানী ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিলেন। তৃতীয়ত: অবৈধভাবে সামরিক বাহিনীর ব্যবহারের দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ফলে কোরিয়ার রাজনৈতিক বৈধতা (legitimacy এবং credibility)-র প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এজন্য তার পক্ষ থেকে কোরিয়ার জন্য এমন কিছু করার প্রয়োজন ছিল যাতে তার জাতি তাকে একজন যোগ্য প্রেসিডেন্টরূপে স্বীকৃতি দান করে। চতুর্থত: ১৯৬০-এর দশক ছিল স্নায়ুযুদ্ধের চরম পর্যায় এবং এসময় এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় সামরিক বাহিনীর অনেক জেনারেল নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুবখান, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস, উগান্ডার প্রেসিডেন্ট মিল্টন ওবতো ও ইদি আমিন, তুরস্কে মার্শাল প্রুশেল প্রমূখ স্বৈরশাসকের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব সাবেক সামরিক প্রধান স্বৈরশাসকদের মতো পার্ক চুং-হি দেশে নজীর বিহীন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ এবং জনগনের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। পঞ্চমত: দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি উন্নতমানের পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক এবং

দারিদ্র্যপীড়িত উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধীনে কোরিয়া উপদ্বীপের একত্রীকরনে বাধ্য বা উৎসাহিত করাও পার্কের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পরিশেষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী শক্তির সমর্থন লাভ করার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়াকে পূর্ব এশিয়া তথা বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরকরনও পার্কের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল।[১৫]

পার্ক চুং-হি তার পূর্বসূরী প্রেসিডেন্ট ড. সীং ম্যান রী-এর মত উগ্র জাতীয়তাবাদী ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। তার বৃহদায়তন অর্থনৈতিক উন্নতির স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি দু'টি মাধ্যমকে বেছে নেন। এর একটি হলো কোরিয়ার পুঁজিপতি, বিনিয়োগকারী তথা Conglomerates-দেরকে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা মোতাবেক বড় বড় শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে বাধ্য করা এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ, বৈদেশিক মুদ্রার যোগান দেয়াসহ উৎপাদিত কোরীয় শিল্প পণ্যের বিক্রয় বা রপ্তানির জন্য আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। কোন কোন ব্যবসায়ী বা শিল্প প্রতিষ্ঠান লোকসানের সম্মুখীন হলে অথবা দেউলিয়া হয়ে পড়লে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হতো এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া হতো। পার্ক প্রশাসনের উপরোক্ত নীল নকশা বাস্তবায়নে হুন্দাই, সামস্যাংসহ জাপানী শাসনামলের এবং রী প্রশাসনের অনেক দোষী ও দন্ডপ্রাপ্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মালিককে মুক্তি দান ও সহায়তা করা হয়। ফলে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃহদায়তন পুঁজিবাদ বা Big capitalism-এর উন্নতি ও বিকাশ ধারা দ্রুততর হয় এবং প্রতিটি কোম্পানির উৎপাদনের ক্ষেত্র বহুমূখী ও বৈচিত্রকরণ করা হয় যাকে কোরীয় ভাষায় multi diversification বলা হয়। সমুদ্রগামী জাহাজ, রেল ইঞ্জিন নির্মাণ থেকে শুরু করে বহুমূখী কোম্পানিগুলো নেকটাই, রূমাল, ভ্যানিটি ব্যাগ ও কলম পর্যন্ত তৈরি করতে থাকে। পার্কের প্রচেষ্টায় কোরিয়ার প্রতিটি বহুমূখী কোম্পানি শীঘ্রই একেকটি আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় এবং বর্তমানে এসব কোম্পানি বা Conglomerate কোরীয় সরকারের গ্যারান্টি ছাড়াই বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, আই.এম.এফ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার নিকট যেকোন অংকের উন্নয়ন ঋণ নিতে পারে।[১৬]

পার্ক চুং-হির Export Promotion Economic Development Policy-র বাস্তবায়নের দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা। কোরিয়ার যুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪০ হাজার মার্কিন সৈন্যের সার্বক্ষনিক উপস্থিতি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাম্যবাদ বিরোধী অবস্থানে সন্তুষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়াকে রপ্তানির GSP সুবিধা এবং অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য প্রদান

করেনি, বরং কোরিয়াকে নিজ ব্যবসায় ও অন্যান্য কর্মকান্ডের সমঅংশীদার করে গড়ে তোলার জন্য সব ধরণের সুযোগ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে। আই.এম.এফ. বিশ্বব্যাংক, এ.ডি.বি.সহ বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কোরিয়াকে বিস্তর অর্থনৈতিক ঋণদান ও আনুষঙ্গিক সুবিধা দান করেছে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ও মধ্যস্থতায় ১৯৬৪-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ, সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ, খাদ্যও রসদ সরবরাহ, পোশাক ও জুতা সরবরাহ প্রভৃতি কাজের ঠিকাদারী লাভ করে। এর ফলে সামস্যাং, হানজিন, হুন্দাই ও দুসান কোম্পানি বিস্তর মুনাফা অর্জন করে এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় বৃহদায়তন পূঁজি বিকাশের অগ্রগতি দ্রুততর হয়।[১৭] আবার মার্কিন মধ্যস্থতায় ১৯৬৫ সালে জাপানের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোরিয়ায় জাপানী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। কোরীয় কোম্পানিগুলো জাপানী ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণের মাধ্যমে তাদের এতদ্‌সংক্রান্ত কর্মকান্ডে আরো দক্ষতা লাভ করে এবং জাপানী অভিজ্ঞতার প্রভাবে কোরিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানার কর্মকান্ডের মধ্যে নতুন ধারার সংযোজন ঘটে।[১৮]

তবে পার্কের প্রশাসনামলে মার্কিন সহযোগিতায় ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে দক্ষিণ কোরিয়ার Conglomerates-গণ মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে সৌদি আরব,কাতার, ওমান, আবুধাবি, লিবিয়া, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব-আমিরাতে বিভিন্ন প্রকার নির্মাণ কাজের ঠিকাদারী লাভ করে। এর ফলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেলপথ স্থাপন, হোটেল, এয়ারপোর্ট, সুউচ্চ ভবন, প্লাজা, টাওয়ার, সুপারমার্কেট, মসজিদ, হাইওয়ে, সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, মরুভূমির জমিকে আবাদীকরন, জলাশয় ও পাহাড় সরিয়ে আবাদী জমি উদ্ধার, বনায়ন, সমুদ্রের মধ্যে বিমানবন্দর নির্মাণ প্রভৃতি নির্মাণ শিল্পের ঠিকাদারী লাভ করার ফলে কোরিয়ার পূঁজিপতি, শ্রমিক কর্মচারী, কর্মকর্তা প্রচুর পরিমানে অর্থ মধ্যপ্রাচ্য থেকে তাদের দেশে পাঠাতে থাকে যা দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহৎ পূঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে উঠতে প্রাচুর্যের সন্ধান দান করে এবং পূঁজি সঞ্চয় বা Capital Accumulation এর পথ প্রশস্ত হয়। অন্যদিকে কোরিয়ার General Trading Company বা GTC মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে GSP-র সুবিধা লাভ করে যা কোরিয়ার অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করে তোলে এবং কোরিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তরান্বিত হয়।[১৯]

পার্ক চুং হি প্রশাসনমালের মাঝামাঝি সময় থেকে দেশের শিল্পায়ন বিস্তার লাভ করে, কোরীয় নাগরিকদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং বাইরের দেশগুলোতে কোরিয়ার শিল্পপণ্য বিক্রয়ের জন্যও

কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোতে বাজার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমতাবস্তায় পার্ক প্রশাসন কোরিয়ায় সীমিত আকারে বিদেশী বিনিয়োগের অনুমতি দান করে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্নদেশে কোরিয়ার চিকিৎসকদল, ঔষধপত্র ও অন্যান্য প্রযুক্তি প্রেরণ করে। এসব সহযোগিতামূলক কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে কোরীয় রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করেছেনঃ

প্রথমত: বিশ্ব মানবতার সেবা করা;

দ্বিতীয়ত:কোরিয়া এক সময় সাহায্য গ্রহণকারী দেশ ছিল। কিন্তু কোরিয়ার পরিস্থিতি উন্নত হবার পর কোরিয়া বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাহায্যের প্রতিদান করতে প্রত্যয় ব্যক্ত করে;

তৃতীয়ত: কোরিয়ার যুদ্ধের পর বিদেশে উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া বিরোধী বিরূপ প্রচারনা মোকাবিলা করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের বন্ধুসূলভ মিত্রতা গড়ে তোলার কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়;

চতুর্থত: বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার দাবি মোতাবেক পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে কোরিয়া উপদ্বীপকে পুন:একত্রীকরনের পক্ষে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা লাভ করা;

পঞ্চমত: এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার দ্বারা ক্রম:বিকাশমান কোরীয় শিল্পপণ্য ও বাণিজ্য সম্ভার বাজার গড়ে তোলা। এছাড়া সস্তায় কাঁচামাল ক্রয় করাও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

ষষ্ঠত: বাণিজ্যিক তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভের জন্য ১৯৬০-এর দশক থেকে কোরিয়ার অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালিত হয়। এজন্য প্রয়োজন ছিল অংশীদার দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে পুঁজিবাদী ধাচে দ্রুত গড়ে তোলার জন্য কোরিয়ার বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতির গোপন রহস্যাবলী অন্যান্য জাতির নিকট উম্মোচন করা। কোরিয়ার পক্ষ থেকে কোন জাতির অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তোলা ও দক্ষ সংগঠক বা উদ্যোক্তাদেরকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা। এভাবে দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশে দরিদ্রতা বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করার জন্য হাতে কলমে সহযোগিতা করতে থাকে।[২০]

১৯৭৯ সালে প্রেসিডেন্ট পার্ক চুং হি তার বাসভবনে অবস্থানরত KCIA কোরিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কর্তৃক নিহত হবার পর দেশে দ্বিতীয়বারের মত সামরিক শাসন জারি হয় এবং ১৯৮৭

সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় যথাক্রমে জেনারেল চুন ডু-হোয়ান এবং রোহ্ তা-উ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে রোহ্ তা-উ দেশে বেসামরিক শাসন চালু করেন এবং গণতন্ত্রকে পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।[২১] রোহ্ তা-উ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে চাঙ্গা করে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য Economic Development Cooperation Fund বা EDCF উন্নয়ন ঋণ ব্যবস্থা চালু করেন। এই ঋণ সহায়তা কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর বড় ধরণের অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল লাইন স্থাপন, রেল ইঞ্জিন ও বগী ক্রয়, সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ, ভূমি উদ্ধার ও উন্নয়ন প্রভৃতি খাতকে উন্নয়নের জন্য তহবিল বরাদ্ধ করা। একইভাবে উন্নয়নশীল দেশ গুলোকে Grant Aid বা মঞ্জরীভিত্তিক সাহায্য প্রদান করার জন্য ১৯৯১ সালে প্রেসিডেন্ট সাম ইয়াং কিম কোরিয়ার জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে Korea International Cooperation Agency বা KOICA গঠন করেন।[২২] ২০০৩ সালে কোরিয়া কর্তৃপক্ষ জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goals-এর পরিপূরক হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা হিসেবে অনুদানের পরিমান মাথাপিছু ১৫৬ শতাংশ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে।[২৩] সুতরাং স্নায়ুযুদ্ধোত্তর যুগে বিশেষ করে একুশ শতকের শুরুতে কোরিয়ার সরকার ও জনগন তাদের দেশে ১৯৮৭ সাল থেকে সূচিত গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রশাসন ব্যবস্থার আরো উদারনৈতিকীকরনের স্বার্থে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য আরো অধিক পরিমান অর্থ বরাদ্দ করার জন্য দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে।[২৪] ফলে ১৯৯৯ সালের পর থেকে কোরিয়ার মোট জাতীয় আয়ের অনুপাতে ODA-এর পরিমান বার্ষিক ০.০৪ থেকে ০.০১ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। তবে উত্তর কোরিয়াকে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষ ধরণের ODA প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং ২০০৭ সালে তা ৫৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে।[২৫] OECD এবং DAC-এর তথ্যানুযায়ী ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কোরিয়া প্রশাসনের লক্ষ্য ছিল বার্ষিক ODA বৃদ্ধির অনুপাত ০.১৮ শতাংশ থেকে ০.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা।[২৬]

আবার কোরিয়ার ক্রমবিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেনীর স্বার্থ ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতেও বিগত বছরগুলোতে কোরিয়া প্রশাসন বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এ কারণে Alf Morten Jerve এবং Hilde Selbervik নামক কোরিয়ার অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদ্বয় মত প্রকাশ করেন যে, æWith its remarkebly successful economic growth its leader and the

growing educated middle-class became increasingly conscious about its role as a modern and aspiring country and as an important power within its region……realization of this aspiration needs a reducation of dependency on the US. normalization of relations with Japan, and an expansion of Korea's international network."[২৭]

এসময় এমন কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাত হয় যেগুলো কোরিয়ার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয় এবং এই নয়া অবস্থানকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে কোরিয়া জাতিসংঘ প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার সাথে সংহতি ব্যক্ত করতে বাধ্য হয় এবং বহুমূখী আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কোরিয়ার মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক এসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৯৯৬ সালে কোরিয়ার OECD সদস্যপদ লাভ, ২০০৫ সালে IDA বা আন্তর্জতিক উন্নয়ন সংস্থা এবং ২০১০ সালের OECD-র DAC-এর সদস্যপদ লাভ করে। এভাবে কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় এর অন্তর্ভূক্তি বৃদ্ধি পায় যা কোরীয় জনগন ও সরকারের আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং সে মোতাবেক ব্যয় করতেও বাধ্য করে।

আবার ২০০৫ সালে বান কি মুন জাতিসংঘের মহাসচিব পদের প্রার্থী হবার পর কোরিয়া সরকার অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য হারে বর্দ্ধিত পরিমান অর্থ বরাদ্ধ করার কথা ঘোষণা করে। এসময় কোরিয়ার দ্বিপাক্ষিক সাহায্যের পরিমান ৪০শতাংশ বৃদ্ধি করা হয় এবং IDA তে কোরিয়ার দেয় অর্থের পরিমান দ্বিগুন করা হয়। ২০০৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়া আফ্রিকার LDCs বা Low Income Countries-এর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বহুগুন বৃদ্ধি করে। এভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া এর অবদানের মাধ্যমে একটি যোগ্য অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে এর ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে।[২৮]

আবার দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনের প্রচারনার মধ্যেও ক্রমবর্দ্ধমানহারে ODA বরাদ্দের স্বপক্ষে জনমত প্রতিফলিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোরিয়াতে 'Global Korea' শ্লোগানটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে এবং তা দক্ষিণ কোরিয়ার ODA বরাদ্দের পরিমানকেও প্রভাবিত করেছে। তাছাড়া সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কম্যুনিষ্ট চীন, জাপান ও রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের উন্নতির প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা

হয়। সুতরাং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম ও ক্রমবর্ধমানহারে ODA বরাদ্দ করার পক্ষে কোরিয়ার বিভিন্ন প্রশাসন 'Global Korea' শ্লোগানটি ব্যবহার করেন। আবার এ সময় থেকে কোরিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতিতে 'market friendliness' 'pragmatism' এবং 'resource diplomacy' প্রভৃতি শব্দ কূটনৈতিকভাবে ব্যবহার করা শুরু হয়।[২৯]

সাম্প্রতিককালে কোরিয়ার এন.জি.ও প্রতিনিধিগণ একটি গবেষণামূলক রচনায় দাবি করেন যে, "that the objective of Korea's ODA are still based on national economic interests or diplomatic interests."এর সাথে আরো বলা হয় æNow a days, this tendency is getting to secure natural resources," যদিও এন.জি.ও এবং সুশীল সমাজ এ প্রবনতার বিরোধীতা করে চলেছে।[৩০] কোরিয়ার বুদ্ধিজীবি, সুশীল সমাজ, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী এবং রাজনীতিবিদদের একটি বড় অংশ কোরিয়ার জাতীয় স্বার্থ বৃদ্ধি ও সংরক্ষনের নিরিখে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অধিক পরিমানে ODA বরাদ্দ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কল্যান ও উন্নয়নের স্বার্থে দক্ষিণ কোরিয়াকে অবশ্যই ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি বড় অর্থনৈতিক শক্তি এবং APEC ও OECD-এর সদস্য হিসেবে এ অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থে কোরিয়ার কিছু করার দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রসংঙ্গে কোরীয় গবেষক ইয়ুন সুন-শিম লিখেছেন, "......offering an enhanced amount of ODA will strengthen the developing countries confidence in Korea whice in turn would prove benefical to Korea in the sense that it will create a conducive environment in the promotion of peace and stability in the Asia Pacific region."[৩১]

তৃতীয়ত: আবার কোন কোন গবেষক কোরিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থের দৃষ্টিকোন থেকেও অধিক পরিমানে ODA বরাদ্দের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন। তাদের মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নধারার সাথে যুক্ত হয়েছে কোরিয়ার জাতীয় স্বার্থের বিভিন্ন দিক। তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১৯৯০-এর দশকে কোরিয়া কর্তৃক বিদেশে সরাসরিভাবে বিনিয়োগ বা Foreign Direct Investment-এর ৫৭.৪ শতাংশ এবং বিদেশের মাটিতে কোরীয় কোম্পানিগুলোর নির্মাণ কাজের ৭৮.৯ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাধিত হয়।[৩২] উল্লেখ্য যে, কোরিয়ার প্রয়োজনীয় জ্বালানী

অপরিশোধিত তেল, গ্যাস, আকরিক লোহা ও রবারের মত খনিজ দ্রব্যের অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে আমদানি করা হয়।

আবার অনেক কোরীয় অর্থনীতিবিদ কোরিয়ার পক্ষে ODA-কে দান খয়রাত হিসেবে দেখার পরিবর্তে এটি এক ধরণের বিনিয়োগ ও দায়দায়িত্ব হিসেবে দেখার আহবান জানিয়েছেন। তাদের মতে, কোরিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ একটি সাহায্য গ্রহণকারী দেশ ছিল এবং এখন কোরিয়ার দায়িত্ব হলো বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উপরোক্ত ধাঁচের দায়িত্ব পালন করা। দ্বিতীয়ত: কোরিয়ার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামোগত উন্নতির দ্বারা কোরিয়া ভবিষ্যতে প্রযুক্তি বিক্রয়ের বাজার লাভ করবে এবং এর ফলে বিশ্বের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং 'haves' এবং 'have nots' দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী উপাদান গুলো আরো সীমিত হয়ে পড়বে। এ প্রসঙ্গে তারা কোরিয়ার নিজস্ব ধাঁচের ODA প্রশাসন ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে Sang Eun Lee লিখেছেন যে, Korea's current position as an ICT leader in Asia indicates that it has got the technological ability to greatly assist developing nations to improve their ICT infrastructure and services ….Korea will also be able to help mitigate the more negative aspects of the digital divide. Human Resource Development is necessary for both donor and the reciptions." [৩৩]

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক সহযোগিতা

এ পর্যন্ত লিখিত কোন গবেষণাকর্মে অথবা কোরিয়া-বাংলাদেশ সরকারদ্বয়ের কোন প্রকার যোগাযোগ পত্রের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি কোরিয়া সরকারের বা KOICA-র সাহায্য কার্যক্রম নীতির বিশেষ কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। তবে কোরিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন ইশতেহার এবং স্মারকলিপিতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় দেশের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো জোরালো করে তোলার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে বিভিন্নমূখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদান করবে। তবে একথা ঠিক যে, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিশেষ করে KOICA-র অনুদান সাহায্য এবং Exim-Bank পরিচালিত Economic Development Cooperation Fund (EDCF) বরাদ্দের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সবসময় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশগুলোর তালিকায় অবস্থান করে। দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক

সহায়তাদানের সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা প্রসংঙ্গে রাজশহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. এ.এফ.এম. শামসুর রহমান মন্তব্য করেছেন যে, The Probable and Pragmatic analysis of the reasons responsible for assisting Bangladesh is that, there are different sectors of socio-economic infrastructure of Bangladesh which are not properly modernized. Therefore, KOICA like US Aid, DANIDA, CIDA as well as JICA, has Always adopted a policy to contribute to the transformations of the most vital sectors of the infrastructure of Bangladesh in phases. An Analysis of the annual reports of KOICA, gives the fact that Bangladesh receives special emphasis on the overall operational programs of KOICA, just after China and Indonesia. [৩৪]

দ্বিতীয়ত: দক্ষিণ এশিয়ার একটি কৌশলগত অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান হবার দরুণ তা বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতা কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, জাপানের শিল্পায়নের পর থেকেই এশিয়ার দেশগুলোতে জাপানী পণ্যের বিক্রয় ও জাপানী কারখানার জন্য কাঁচামাল ক্রয়ের বাজার হিসবে গড়ে তোলার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে এশিয়াও আফ্রিকার দেশগুলো বিশেষ করে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জাপানী আর্থিক সহায়তার সিংহভাগ লাভ করে থাকে।[৩৫]

দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক বাংলাদেশকে সহযোগিতাদানের অপর একটি সম্ভাব্য কারণ হলো জাতিসংঘের পক্ষ থেকে অধিক জনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমস্যা লাঘব করার জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি জানানো আহবানে সাড়া দান। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সালে DAC সম্মেলনে এ ধরণের সহযোগিতা দানের আহবান জানানো হয় এবং এরপর ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের উদ্যোগে LLDC-র জন্য উল্লেখযোগ্যহারে New Program of Action-এর আহবান এবং ১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত আঙ্কটাড-এর সপ্তম অধিবেশনের চূড়ান্ত পত্রে এ ধরণের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়। এসব সম্মেলনের আহবানের গুরুত্ব সম্পর্কে ড. শামসুর রহমান লিখেছেন, " This accords Bangladesh a special weight among them. Korea has attached increse significance to Bangladesh as a way of sharing its burden in international efforts toward poverty alleviation."[৩৬] এছাড়া

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরিয়ার প্রতি শুভেচ্ছামূলক মনোভাব গড়ে তোলাও উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার অন্যতম কারণ। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতাসুলভ মনোভাব ব্যক্ত করেছে। কোরিয়া কর্তৃপক্ষ জনবহুল বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মধ্যমশ্রেনীর দেশ হিসেবে বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে। এভাবে ড. শামসুর রহমানের ভাষায় বলা যায় যে, æ…… it is appropriate to characterize Korean aid to Bangladesh as motivated by its view of Asia as Korea's responsibility for poverty alleviation, and by its pursuit if good will among developing countries."[৩৭] উপরোক্ত নীতি ও আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী কাঠামোয় রূপান্তরের জন্য বিভিন্নখাত যেমন, দারিদ্র্য বিমোচন, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, প্রযুক্তিগত উন্নতি, চিকিৎসা সুবিধা, কৃষি ব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনা, জনপ্রশাসন, সেচ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বাংলাদেশী পণ্যের বাজার বিস্তার, বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দান করে চলেছে। এসব খাতের রূপান্তরের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে কোরীয় অর্থনীতির একটি সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রতিটি শহর ও নগরীতে কোরীয় শিল্পপণ্য সামগ্রীর ব্যাপক বাজার গড়ে উঠেছে। এ প্রসংঙ্গে ড. শামসুর রহমান লিখেছেন যে, æ……the grants assistance of KOICA serves the parpose of economic diplomacy of increasing penetration of the Korean business into the market of Bangladesh as well as the development of Bangladesh infrastructure." [৩৮]

উৎস,তথ্য ও উপাত্তের ব্যবহার

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর এ পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণাও সমন্বিত পুস্তক রচিত হয়নি। অথচ G-8-এর অন্তর্গত একটি অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যকার বিরাজমান সম্পর্কের বিভিন্নদিক সম্বন্ধে সমকালীন ইতিহাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীও গবেষকদের জানা উচিৎ অথবা ধারণা থাকা স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষ করে, বাংলাদেশের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষজ্ঞ, পন্ডিত ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারক ও জাতীয়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং BOESL বা Bangladesh Overseas Employment Services Limited-এর সদস্য ও পরিচালক মন্ডলীর এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা থাকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বস্তুত এ প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিবোধ থেকেই বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পর্কে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি লিখতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয়প্রকার তথ্য উপাত্তের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তের মধ্যে রয়েছে কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের (দক্ষিণ কোরিয়ার)-Korea International Cooperation Agency বা KOICA-র বাৎসরিক প্রতিবেদন, KOICA Country Program-এর কার্য বিবরণী, Korea Export-Import Bank এর Economic Development Cooperation Fund-এর বরাদ্দ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের উন্নয়নে এ তহবিলের ব্যবহার ও প্রয়োগ, কোরীয় সরকারি কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, KOICA-র বিভিন্ন Project type Cooperation এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ও কোরীয় কর্মকর্তদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যৌথ মিটিং এর কার্য বিবরণী (KOICA Papers-এ সংরক্ষিত), KOICA Report to the Committee of Unification, Diplomacy and Trade in the 198th National Assembly Session in 1999, KOICA Statistics (for different years), কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রকাশিত Koreas Official Development Assistance, Korea Institute of International Economic Policy বা KIEP কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সময়ের “Policy Debate on Problems and Mangement of OFDI” প্রভৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া কোরিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমিক ও জনশক্তি রপ্তানির জন্য BOESLকর্তৃক প্রকাশিত “Bangladesh Manpower” শীর্ষক প্রতিবেদন, UNDP (Dhaka-র) কর্তৃক প্রকাশিত Recruitment and Placement of Bangaldeshi Migrant Workers: An Evalutaion Of the Process”(2002) শীর্ষক প্রতিবেদন, এবং *The Korea Post* এবং *The Financial Express* কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য তথ্য ও উপাত্ত। আবার বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার EPZ-গুলোর তৎপরতা সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায় Bangladesh Export Processing Zones কর্তৃক প্রকাশিত *News Letters*-এ এবং

বিভিন্ন কোরীয় EPZ-এর পক্ষে প্রকাশিত নিজস্ব প্রতিবেদন থেকেও এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে। সবশেষে, বাংলাদেশে KOICA সহ অন্যান্য কোরীয় সংস্থার পক্ষে কর্মরত কোরিয়ার বিভিন্ন NGO-র প্রতিবেদনও এ গবেষণাকর্ম লিখতে ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে KDAB, Human Habitat, The World Vision, Good Neighbors International এবং CARITAS-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রকাশিত দ্বৈতয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে মুষ্টিমেয় পুস্তক ও প্রবন্ধ। এর মধ্যে প্রফেসর ড. রেহমান সোবহান (১৯৮২) লিখিত, *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh* (Dhaka: University Press) বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য কার্যক্রমের ওপর লিখিত একটি মৌলিক গ্রন্থ। কুমিল্লা BARD-এর প্রাক্তন পরিচালক জনাব খায়রুল কবীর (২০০৬) লিখিত æKorea Overseas Volunteers (KOV) Program in Bangladesh" in the Proccedings of The Ninth Consultation Meeting on the Korea Overseas Volunters Program" বাংলাদেশ-কোরিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার ওপর লিখিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। একই বিষয়ের ওপর লিখিত Sang-Tae Kim (2003)-এর *ODA Policy of the Republic of Korea : In the Context of its Evolving Diplomatic and Economic Polices* (Seoul:KOICA) এবং Ministry of Foreign Affairs and Trade, (ROK) [2000], *Korea's Official Development Assistance* (Seoul:MOFAT) অপর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ। BARD-এর কর্মকর্তা আব্দুল কাদির কর্তৃক ২০০৩ সালে সিউলে অনুষ্ঠিত ১০ম EDCF Workshop-এ উপস্থাপিত æBangladesh and EDCF" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে Korea Exim Bank কর্তৃক ২০০৩ সালে প্রকাশিত *Politics and Procedures in Received ODA Loans*-শীর্ষক Proceedings-এ। বাংলাদেশে কোরিয়ার EPZ তৎপরতার ওপর Helal Uddin Ahmed (2007) লিখিত EPZs of Bangladesh Promises Galorie in the *Korea Post*, Vol,120, No.3, March 2007. এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর লিখিত একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ। বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য (১৯৯৮) লিখিত Export Processing Zones in Bangladesh Economic Impact and Social Issues, Working Paper

No.80, International Labor Office, Geneva; এবং Asif Dowla (1997) লিখিত Export Processing Zones in Banglaesh: The Economic Impact in Asian Survey, Vol.37, No.6; এবং Munir Quddus and Rashid Salim (2000) লিখিত Enterpreneurs and Economic Development: The Remarkable Story of Garment Exports from Bangladesh (Dhaka: The University Press); এবং Naila Kabber and Mahmud Simeen (2004), এর Globalization , Gender and Poverty Bangladeshi Women Workers in Export and Local Markets" in Journal of International Development, Vol.16, No.1 pp.93-109 প্রভৃতি বাংলাদেশে কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন অঞ্চলের ওপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। একইভাবে কোরিয়ায় বাংলাদেশী জনশক্তির রপ্তানির ওপর Byung-Hee Lee, Hye-Won Kim, Jean-Ho Jeong and Seong Jae Cho (edited), *Labor in Korea ,1987-2006: Looking Through the Statistical Lens* (Seoul: Korea Labor Institute) একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম যাতে কোরিয়ায় বিদেশী শ্রমিকদের আমদানি, অবস্থান ও অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, Christopher M. Dent (2002), গবেষণামূলক পুস্তক *The Foreign Economic Policies of Singapre, South Korea and Taiwan* (Northamton Mass:Edgar Allen); এবং Samuel S. Kim (ed)[2000] *Korea's Globalization* (Cambridge: Cambridge University Press) এ Chae Jin Lee লিখিত, "*South Korean Foreign Relations Face the Globalization Challenges*" গবেষণাকর্মটি কোরিয়ার Political economy এবং অর্থনৈতিক কূটনীতির ওপর লিখিত দু'টি মূল্যবান রচনা।

তবে কোরিয়ার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং কোরিয়া-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর উপরোক্ত গবেষণামূলক পুস্তক ও প্রবন্ধগুলোতে বিষয়ভিত্তিক আকারে ধারাবাহিক আলোচনা বা বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন করা হয়নি। বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তকে কেবলমাত্র ইস্যু বা বিষয়ভিত্তিক ইতস্তত ও বিখন্ডিত আকারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

এমতবস্থায় বর্তমান গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক চিত্র সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে উপস্থাপন

করা। ফলে বর্তমান গবেষণাকর্মে কোরিয়া-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রধান ক্ষেত্রগুলোর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং উপসংহারে উক্ত সহযোগিতার ফলাফল ও প্রভাব উভয়দেশের দৃষ্টিকোন থেকে নিরূপন করার প্রয়াস লাভ করা হয়েছে।

মোটামুটিভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের আলোকে বর্তমান গবেষণকর্মে কোরিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্কের নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে বের করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এগুলো হলোঃ

প্রথমত: কোরিয়া কিভাবে একটি সাহায্য গ্রহণকারী দেশ থেকে সাহায্যদাতা দেশে পরিণত হয় ?

দ্বিতীয়ত: কোরিয়ার অর্থনীতির বিভিন্নখাতের আধুনিকীকরনে জাপানী ও মার্কিন ভূমিকা ও প্রভাব কতটুকু ছিল ?

তৃতীয়ত: কোরিয়ার অভ্যন্তরীন পরিস্থিতি এর অর্থনৈতিক উন্নতির ধারাকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

চতুর্থত:ভিয়েতনাম যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে নির্মাণকাজের ঠিকাদারী লাভ এবং মার্কিন সহযোগিতা কিভাবে কোরিয়াকে একটি বড় পূঁজিবাদী দেশে পরিণত করতে সহায়ক হয়?

পঞ্চমত: কোরিয়া কেন বাইরের দেশগুলোকে বিভিন্ন মাত্রার সহযোগিতা দান করতে শুরু করে ?

ষষ্ঠত: কোরিয়া নিজের দ্রুত উন্নয়নের অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য দেশকে শিক্ষাদানের দ্বারা কিভাবে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারাকে প্রভাবিত করে?

সপ্তমত: এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্নদেশে কোরিয়ার শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টির প্রয়াসকে কিভাবে কোরিয়ার অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সাথে সম্পৃক্ত করা হয় ?

অষ্টমত: কোরীয় সংস্কৃতির বিস্তার সাধনের লক্ষ্য এই বন্ধুসুলভ আচরনের মধ্যে কতটুকু নিহিত ছিল?

নবমত: বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধানে কোরিয়ার শিল্প-কারখানাও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশের জনশক্তির নিয়োগ ও কর্মসংস্থানে এদেশের অর্থনীতির উন্নয়নধারাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

অধ্যায় বিন্যাস

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে বর্তমান গবেষণাকর্মের অধ্যায়গুলো বাংলাদেশ-কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখিত হয়েছে। ক্রমানুসারে অধ্যায়গুলোর শিরোনাম নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

প্রথম অধ্যায়: বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সাহায্য (ODA), ১৯৮৭-২০০৭

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ১৯৭৩-২০০৭

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ, ১৯৮৭-২০০৭

চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশে কোরীয় ই.পি.জেড. স্থাপন ১৯৯৫- ২০০৭

পঞ্চম অধ্যায়: Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং বাংলাদেশে এর অনুদান ভিত্তিক সাহায্য তৎপরতা, ১৯৯১-২০০৭

ষষ্ঠ অধ্যায়: দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি, ১৯৮৭-২০০৭

উপসংহার:

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা কর্মটি লিখতে আমি ঐতিহাসিক ও Empirical বা ফলিত উভয় প্রকার গবেষণা পদ্ধতির ব্যবহার করেছি। বিভিন্ন মৌলিক তথ্য ও উপাত্তকে বিষয়বস্তু অনুসারে শ্রেনীকরন করার সাথে সাথে সেগুলোর মূল বক্তব্য বিভিন্ন অধ্যায়ে আমার বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করেছি। একইভাবে দ্বৈতয়িক উৎস বা প্রকাশিত পুস্তক, প্রবন্ধ, প্রতিবেদন, সাক্ষৎকার, সংবাদপত্র ভিত্তিক তথ্য ও সম্পাদকীয় থেকে নেয়া তথ্য ও উপাত্তকে গবেষণার মৌলিক বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্নস্থানে সন্নিবেশ করেছি এবং এসব তথ্য ও উপাত্তের থেকে মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি দান করেছি। আবার Bangladersh Overseas Employment Services Limited বা BOESL, বাংলাদেশের এন.জি.ও বিষয়ক ব্যুরো এবং অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর বিভিন্ন সময়ে লিখিত যোগাযোগ পত্র বা Correspondence, স্বারকলিপি এবং প্রতিবেদনও এ গবেষণা কর্মে ব্যবহার করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরীয় দূতাবাসে অবস্থিত KOICA-র কার্যালয় এবং কোরিয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তকে এ গবেষণা কর্ম লিখার সময় ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. এ.এফ.এম.শামসুর রহমান দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপর একজন দীর্ঘদিনের গবেষক। তিনি কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অবস্থিত, Korea Foundation Librabry, Korea Develoment Institute, (KDI), Korea Development Institute School (KDIS), Korea Export-Import Bank, Asiatic Research Center (Korea University, Seoul), Graduate School of International Studies (Sogang University, Korea University, Yonsi University EHWA Womans University, (Seoul), Korea National Archives এবং KOICA Library

(Seoul), সাক্ষাৎকার ও বইপুস্তক সংগ্রহ করেছেন এবং তিনি আমাকে এ গবেষণকর্ম লেখার জন্য তার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহার করার অনুমতি দান করেছেন। আমি কোরিয়া থেকে প্রাপ্ত সকল প্রাথমিক ও দ্বিতীয় শ্রেনীর উৎস উপরোক্ত সংগ্রহশালা থেকে সংগ্রহ করেছি।

গবেষণা কর্মটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

দক্ষিণ কোরিয়া বা কোরিয়া প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তাদানকারী চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম, কৃষি, প্রযুক্তি বিশেষ করে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি, কোরীয় ভাষা, বেকার সমস্যার প্রশমন, ত্রাণ সহযোগিতা, উন্নয়ন ঋণ সহায়তা, এবং বহুমূখী বাণিজিক, শিল্প-কারখানা ও আবহাওয়া জলবায়ু বিষয়ক সৃষ্ট সমস্যার সমাধানে দক্ষিণ কোরিয়া ১৯৮০-র দশক থেকে এ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দান করেছে। বাংলাদেশের জনপ্রশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, আধুনিক ও আদর্শ পল্লী গঠন প্রভৃতি থেকেও কোরিয়া সহায়তা দান করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যূতেও পারস্পরিক সহযোগিতা দান করেছে। বাংলাদেশ এখন কোরীয় পণ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার এবং বাংলাদেশে কোরীয় ই.পি.জেডগুলো এখন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের বড় বড় সেতু, সড়ক ও রেলপথ নির্মাণ, বাংলাদেশের জন্য সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ, সার ও অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য গুদাম নির্মাণ প্রভৃতি নির্মাণ কাজে দক্ষিণ কোরিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ গঠনমূলক সহযোগিতা দান করেছে। সর্বোপরি, বাংলাদেশে অবস্থিত কোরিয়ার বিভিন্ন কারখানা এবং কোরিয়াতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা, কৃষি ও বাণিজ্যিক সেক্টরে অসংখ্য বাংলাদেশী শ্রমিক ও কর্মচারী কর্মে নিযুক্ত রয়েছে।

বর্তমান গবেষণাকর্মে উপরোক্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর ওপর বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি লিখতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও উপাত্তের ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর ফলে গবেষণা কর্মটি ২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি প্রামাণ্য দলিলে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ-কোরিয়া সম্পর্কের গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা এটিকে একটি উৎস পুস্তক হিসেবে অধিক গবেষণার জন্য ব্যবহার করতে পারবে। পূর্ব-এশিয়ার ইতিহাস ও অথনৈতিক কূটনীতির শিক্ষার্থীরা এ গবেষণার মধ্যে কোরিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্কের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস দেখতে পাবেন যা উভয় দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসের পুণর্গঠনে সহায়ক হবে। আবার বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারক

কর্মকর্তাগণ এ গবেষণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা লাভ করবেন। এভাবে উভয়দেশের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের দৃষ্টিকোন থেকে এ গবেষণাকর্মের ন্যায্যতা, গুরুত্ব ও উপযোগিতা প্রতিপন্ন করা যায়।

তথ্য নির্দেশ:

১. http://english.peopledaily.com.cn/200705/27/eng20070527_378306.html

২. http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2008/11/176_19927.html

৩. http://www.theindependent-bd.com/details.php?nid=102463

৪. http://www.answers.com/topic/bangladesh#ixzzlnz24qXFC

৫. http://en.wikipedia.org/wiki/South-korea

৬. æKorea'sGeography"(http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/geography.html#TERRITORY) Asianinfo.org.2010-02-01 http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/geography.html#TERRITORY.Retrieved2010-07-13

৭. মোঃ আকরামুল খান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্ব রাজনীতি , (ঢাকাঃ সারথী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃষ্ঠাঃ-১৪

৮. http://en.wikipedia.org/wiki/foreign_relations_of_south_korea Caterories: Foreign relations of South Korea.

৯. জাপানের ঔপনিবেশিক শাসনামলে আত্মপ্রকাশকারী কোরীয় পুঁজিবাদেও জন্য দ্রষ্টব্য, Ramon H:Myers and Mark R.Peattie (1984) (eds) *The Japanese Colonial Empire, 1895-1945* (Princeton N.J: Princeton University Press).

১০. দ্রষ্টব্য, In–Young Kim(1996), æThe Political Economyof a *Cheabol's* Capital Accumulation in South Korea: The Case of Samsung 1938-1987" Ph.D. Dissertation, Dept.of Political Science, University of Hawaii.,pp.61-67.

১১. প্রাগুক্ত,pp.67-70.

১২. প্রাগুক্ত,

১৩. Robert T. Oliver,(1978),*Syngman Rhee and American Involvement in Korea* 1942-1960 (Seoul: Panmun Book)

১৪. Han, Sung-Joo (1974), *The Failure of Democracy in South Korea* (Berkeley: University of California Press).

১৫. Norman Jacobs (1985), *The Korean Road to Modernization and Development*

(Urbana: University of Illinois, Press).

১৬. Prak Chung-Hee (1979), *Korea Reborn: A Model for Development* (Englewood cliffs: Prentiee Hall), এবং Park Chung-Hee, (1971),*To Build a Nation* (Washington D.C:Acropolicis Books).

১৭. প্রাগুক্ত,

১৮. Kyu-Uck Lee, (1986), [ed] *Industrial Development: Policies and Issues* এবং আরো দ্রষ্টব্য, Daniel A. Mefraux (1993) æJapan's Influence on Modern Korean Economic Development æ in *The Journal of Modern Korean Studies* Vol.5, August,1993,pp.25-41.

১৯. দ্রষ্টব্য, Donald Kirk, (1994) *Korean Dynasty: Hyundai and Chung Ju Yung* (Hongkon:Asia 2000 Ltd). Pp.81-96.

২০. Christopher M.Dent (2002), *The Foreign Economic Polices of Singapore, South Korea, and Taiwan* (Northampton, Mass:Edgar Allen), P.204.

২১. প্রাগুক্ত,

২২. প্রাগুক্ত,

২৩. প্রাগুক্ত,

২৪. প্রাগুক্ত,

২৫. প্রাগুক্ত,

২৬. দ্রষ্টব্য, OECD,-2008:7

২৭. Alf Mortem Jerve and Hilde Selbervik, æCMIREPORT: Self Interest and Global Responsibility, Aid Policies of South Korea and India in the Making, www.cmino/publications,p.2

২৮. প্রাগুক্ত এবং আরো দ্রষ্টব্য, Jerve and Selbervik p.34.

২৯. http//www.Tokyo Foundation.orglen/arlies/a new era in South-Korean foreign policy.

৩০. Representatives of Korean NGOs, æPosition Paper of Korean NGOs" March,2008:3.

৩১. Yoon-Sun Shim æKorea's ODA" (M.A. thesis, Dept.of International Relations, Ehwa Womans University, 1999).

৩২. Ministry of Foreign Affairs (ROK),[1997] *Korea's Official ODA* (Seoul) p.14.

৩৩. Sang Eun Lee, æThe Role of Korea's ODA, pp.43-44.

৩৪. A.F.M.Shamsur Rahman (2008), The Korea International Cooperation Agency (KOICA) and its Grants Assistance Policy towards Bangladesh:An Analysis in *Korean Studies Forum* Vol.3, Yonsei University press,Seoul Korea pp.191-192.

৩৫. প্রাগুক্ত,

৩৬. প্রাগুক্ত, p.192

৩৭. প্রাগুক্ত,

৩৮. প্রাগুক্ত, p.194.

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সাহায্য (ODA), ১৯৮৭-২০০৭

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার নিকটতম বাণিজ্যিক সহযোগী দেশ। দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় বাংলাদেশে অবস্থিত কোরিয়ার বাণিজ্যিক কোম্পনিগুলো খুব দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে সপ্তম পুঁজি বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে পরিচিত, যদিও ভিয়েতনাম, চীন, বার্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার তুলনায় বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ যথেষ্ট কম। ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় ২৬৯টি নিবন্ধনকৃত কোরীয় কোম্পানি কর্মকান্ডে নিয়োজিত আছে এবং এসব কোম্পানি প্রায় ৬১৪.৪২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। বিগত সাত বছর যাবত দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে অনেক প্রকৌশলীকে কোরিয়াতে আমন্ত্রণের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও কারিগরি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হয়েছে এবং বাংলাদেশের শিল্পায়ন খাতে যে পশ্চাদপদতা ছিল তার অনেকটাই সমাধান হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, এসময় থেকে দক্ষিণ কোরিয়া এর সরকারি উন্নয়ন সহযোগিতা বা Official Development Assistance (ODA)-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে প্রাধান্য দান করেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে দক্ষিণ কোরিয়া, বাংলাদেশ এবং এশিয়ার অধিকাংশ দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। এছাড়া সাংস্কৃতিক ও ভৌগলিক দিক দিয়েও এসব দেশের মধ্যে রয়েছে যথেষ্ট মিল যা বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অধিকন্তু বাংলাদেশে প্রচুর জনশক্তি আছে এবং তুলনামূলকভাবে এদেশে পারিশ্রমিকের হারও যথেষ্ট কম। এসব জনশক্তি বাংলাদেশে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানিগুলোতে অত্যন্ত দক্ষতা ও সফলতার সাথে কর্মতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া এর দেশীয় প্রযুক্তি এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কোরীয় মডেলে শিল্পপণ্য উৎপাদন করে থাকে। এসব শিল্পপণ্য উৎপাদনের ফলে এক দিকে যেমন দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে বাংলাদেশও এর জনশক্তির একটি অংশকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের অবকাঠামোগত খাতও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে অবস্থিত কোরীয় কোম্পানিতে কাজ করার ফলে বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশী শ্রমিকদের চাহিদাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া কোরীয় সুযোগ-সুবিধা লাভ করে বাংলাদেশী জনশক্তি দক্ষিণ কোরিয়াতেও যথেষ্ট সুনাম

অর্জন করেছে। এর ফলে কোরিয়াতে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্পকারখানায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব পদক্ষেপ বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জল করেছে যা নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে আরো বড় ধরণের সফলতা অর্জনে সহায়ক হবে।

ODA কি?

পুঁজিপতি বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের মত একইভাবে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার সরাসরি বিনিয়োগ চালু করার পূর্বে 'বিদেশী সহায়তা' বা 'Foreign Aid' প্রকৃতি সহায়তা নীতি চালু করে যা সরকারি উন্নয়ন সহযোগিতা বা Official Development Assistance (ODA) নামে পরিচিত। উল্লেখ্য যে, 'Foreign Aid' এবং 'ODA' নীতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দু'টি শব্দ। 'Foreign Aid' শব্দটি 'ত্রাণ সহায়তা' সংক্রান্ত শব্দের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণত যে সমস্ত দরিদ্র ও অনুন্নত দেশকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য করে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয় এবং যার কোন বিনিময় মূল্য গ্রহণ করা হয় না সেক্ষেত্রে 'Foreign Aid' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[1] আর 'ODA' শব্দটি ব্যবহার করা হয় যেখানে 'Foreign Aid'-এর পাশাপাশি কমপক্ষে ২৫ শতাংশ সুদ ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয় এবং যা ফেরতযোগ্য। এটি সাধারণত উন্নত রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষি প্রধান দেশ ও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী দেশের ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়। তবে 'ODA' সহায়তা মুনাফা ভিত্তিক বিনিয়োগ নয় অথবা অধিক লাভের আশায়ও তা প্রদান করা হয় না।

দক্ষিণ কোরিয়ার উপরোক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ও পদ্ধতি উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। এ ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ 'একটি অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশ' (a global economic gaint) হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার ODA নীতিটি অনুসরন করতঃ তাদের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণসহ অর্থনৈতিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে পারে। কারণ ১৯৭০ সালের দিকেও দক্ষিণ কোরিয়া ছিল একটি সাহায্য গ্রহীতা দেশ। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ দেশটি এর ODA Policy এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী একটি দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার ODA নীতি প্রথম প্রবর্তন করা হয়। অবশ্য তখনো পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত উন্নত দেশের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণসহ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে আর্থিক ও ত্রান সহায়তা গ্রহণকারী একটি রাষ্ট্র ছিল।[২] কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পরই দক্ষিণ কোরিয়া নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত রাষ্ট্রের সক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৯৮০-র দশকে কোরিয়ার ODA নীতি

১৯৮০-এর দশকে কোরিয়ার Official Development Assistance বা ODA নীতিটি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এসময় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের সহযোগিতার অংশ হিসেবে Korea Development Institute (KDI), International Development Exchange Program নীতি গ্রহণ করে এবং কোরিয়ার Ministry of Construction উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রকৌশলীদের কোরিয়াতে আমন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকৌশল ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে থাকে। এদিকে কোরীয় ODA সহায়তার ইতিহাসে Economic Development Cooperation Fund (EDCF) প্রতিষ্ঠা একটি 'মাইলফলক' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।[৩] EDCF সংস্থার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিপাক্ষিক ঋণ দান করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তাসহ বিভিন্নমূখী সহায়তামূলক কার্যক্রম শুরু করে। এক্ষেত্রে Korean Export-Import Bank কে EDCF ঋণ প্রদানের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাংক EDCF তহবিল গঠন, প্রকল্পের রক্ষনাবেক্ষণ, প্রকল্প পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদানের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে থাকে। কোরীয় ODA সংস্থার দ্বিতীয় সফলতম পদক্ষেপ হলো ১৯৯১ সালে কোরিয়ার Ministry of Foreign Affairs (MOFA)-র অধীনে Korea International Cooperation Agency (KOICA)-র প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া এর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে দ্বিপাক্ষিক ঋণ ও ত্রান সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোরীয় ODA সংস্থাটি বড় পরিসরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে। এভাবে দক্ষিণ কোরিয়া এর ODA ঋণ ও সাহায্য কার্যক্রমকে একটি সুষ্ঠু নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে দিয়ে পরিচালনা করতে থাকে।

কোরীয় সহায়তার শ্রেণীবিন্যাস

কোরীয় EDCF ফান্ডের দায়িত্ব যখন কোরীয় Exim-Bank-এর ওপর অর্পন করা হয় তখন থেকে KOICA জাতিসংঘের ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার মত কোরিয়ার Ministry of

Foreign Affairs and Trade-এর নানামূখী ত্রাণ সহায়তা পরিচালনা করে যা অর্থমন্ত্রণালয়ের স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমকে যথেষ্ট গতিশীলতা দান করে। এভাবে KOICA এর সীমিত অর্থের দ্বারা বিবিধ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।[৪]

কোরীয় ত্রাণ সহায়তার বৈশিষ্ট্য

পুঁজির সীমাবদ্ধতা থাকা স্বত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যতাকে কাজে লাগিয়ে বিগত ৫০ বছরে দক্ষিণ কোরিয়া সৃজনশীল কাজে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছে। কোরিয়ার এই দ্রুত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে সেদেশের শিক্ষিত ও উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন জনশক্তি। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রের অগ্রগতির মূলে ছিল সেখানকার শিক্ষার উন্নত পরিবেশ। শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যাপক উন্নতি দক্ষ জনশক্তি তৈরির বীজতলা বা Seed-bed হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে এই শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিই কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

১৯৭০ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এভাবে অতি দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া (a newly industrialized state) ‘একটি নতুন শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে’ উপনীত হয়। এ সময় উন্নয়নশীল দেশের নীতিনির্ধারক ও বিশেষজ্ঞগণ দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নতির এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রসঙ্গে আশংকা প্রকাশ করেন। কিন্তু সকল আশংকা উপেক্ষা করে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি লাভ করে। দক্ষিণ কোরিয়ার এ উন্নতির পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কাজ করেছে তা হলো শ্রম আইন সংক্রান্ত নীতিমালা।[৫] এছাড়া দক্ষ জনশক্তিও দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতির আরেকটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। এসব দিক বিবেচনা পূর্বক বিশেষজ্ঞগন এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচিৎ কিভাবে দক্ষিণ কোরিয়া সকল শ্রেণীর মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত উন্নত রাষ্ট্রে উপনীত হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং এ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা।

দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক অন্যান্য দেশকে ODA সহায়তা প্রদানের কারণ

অন্যান্য উন্নত দেশের মত দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশকে দ্বিপাক্ষিক ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এই সহায়তামূলক সম্পর্ক স্থাপন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তার আলোকে বিচার করা হয়। এ প্রসঙ্গে হিয়্যুন সিক চ্যাং,

আর্থার এম. ফিল এবং মাইকেল বেয়ার্ড বলেন যে, æ…the more powerful countries may relate to commercial, diplomatic and strategic objectives while smaller donor countries may be more interested in humanitarian goals and the maintenance of the international system.”[৬]

মানবিক সহযোগিতা

Development Assistance Committee (DAC) এবং Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) সংস্থাভূক্ত উন্নত রাষ্ট্রসমূহ ODA সহায়তার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেছে। এই সংস্থাসমূহ সাধারণত তাদের সহায়তার ক্ষেত্র হিসেবে মানবতাবাদকে বেশি প্রধান্য দান করে থাকে। এসব রূপরেখার মধ্যে তারা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও প্রদানসহ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদানের রূপরেখা প্রণয়ন করে। এ প্রসঙ্গে কোরীয় ODA সহায়তা সংক্রান্ত গবেষক ইউন সান সিম এর বক্তব্য প্রনিধাণযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে, æ…the maintenance of the international system have not been the main objects to be considered in determining Korea’s ODA policy since Korea is still bent on expediting its own economic development.”[৭] তিনি আরো লিখেছেন, æKorea doesn’t have ‘global strategic objectives nor special bilateral relationships with any developing countries’ as it has been very common practice of most donor powers in terms of their relationships with former colonies.”[৮] তিনি আরো লিখেছেন, æKorea’s ODA policy has been largely determind by diplomatic and commercial objectives”.[৯] মিঃ সাম (Shum) এই ঘটনাকে ‘কোরিয়ার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা’ বা ‘Korea’s national goal’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১০] এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘Korea’s ODA is basically an element in its relationship with foreign country’s and under the basically an element in its relationship with foreign countries and under the particular circumstances of the countrie’s division, on the whole, pursued to serve national diplomatic go as until recently”.[১১]

১৯৬০ থেকে ১৯৮০-র দশকের মধ্যে বিদেশী বিনিয়োগ ও ত্রাণ সহায়তা থেকে কোরিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে এবং তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোরিয়ার ODA সহায়তা নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে। এই নীতির মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া সহায়তা গ্রহণকারী দেশসমূহের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া লাভ করেছে যা দেশটিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারীর স্থান দান করে এবং এভাবে দক্ষিণ কোরিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানকারী দেশের তালিকায় উপনীত হয়। বিশেষ করে Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) এবং Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC)-এর সদস্যভুক্ত হওয়ার পর আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার দায়িত্ব বহুগুনে বেড়ে যায় এবং এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর নেতৃত্বপ্রদানকারী দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে। দক্ষিণ কোরিয়ার ODA সহায়তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে কোরীয় বন্ধুত্ব ও প্রীতিকে আরো সুদৃঢ় করে যা দেশটির অধিক অগ্রগতির জন্য আত্মবিশ্বাসকে আরো বর্দ্ধিত করে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে তা কোরীয় উপদ্বীপের একত্রীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ কোরিয়াকে আরো দায়িত্বশীল করে তুলেছে।[১২]

বাংলাদেশ যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে ত্রাণ ও নগদ অর্থ প্রদান করে থাকে। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা হলে কোরিয়া সরকার বাংলাদেশকে ৫০,০০০ মার্কিন ডলার সমমূল্যের ঔষধ ও এ্যাম্বুলেন্স সহায়তা এবং বন্যা পরবর্তী পুণর্বাসনের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ডলার মূল্যের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। এরপর ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ ঘূর্নিঝড়ে আক্রান্ত হলে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে ১ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এবং ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ডায়রিয়া প্রতিরোধ সহায়তা প্রদান করে। এছাড়াও দক্ষিণ কোরিয়া জাতিসংঘ উদ্বাস্তু সংক্রান্ত কমিশনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরনার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৯২ সালে বাংলাদেশকে প্রায় ৫০,০০০ মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

কোরীয় ODA নীতির বর্তমান চিত্র

সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ার ODA সহায়তা নীতি ও কার্যক্রম ১৪০টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ এই বিস্তৃতিকে খুব বেশী বড় করে দেখতে রাজী নন। তাদের মতে,

দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য প্রয়োজন বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই সহায়তার পরিমান আরো বৃদ্ধি করা এবং বিশ্বের দারিদ্র্য বিমোচন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। তবে কিছু কিছু দেশ, যেমন- ভিয়েতনাম, চীন ও ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার এই সহায়তা নীতিকে সানন্দে গ্রহণ করেছে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ার ODA নীতির মূল লক্ষ্য হলো এর পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রকে আরো সম্প্রসারিত করা।

পরিসংখানের মাধ্যমে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলে। এমনকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক সূচক সবসময় দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালে দক্ষিণ কোরিয়া উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে প্রায় ৪৪.৩% অপরিশোধিত তেল এবং ৯৯% প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানি করে। এছাড়া ১৯৯৬ সালে দেশটি উন্নয়নশীল দেশগুলোত ৫৭.৩% সরাসরি বিনিয়োগ করে এবং ৭৮.৯% নির্মাণ খাতে সহায়তার আশ্বাস প্রদান করে।[১৩]

উন্নয়ন খাতে দক্ষিণ কোরিয়ার নৈতিক সহযোগিতা

দক্ষিণ কোরিয়া তার দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সঞ্চিত নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও কারিগরি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেছিল। এই অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় এলাকার দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে দক্ষিণ কোরিয়া এত দ্রুত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হলো এতদ্‌সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম এসব দেশ অনুসরন করে চলেছে। এদিকে উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সহযোগিতাসহ মধ্যপন্থী কারিগরি সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে।

বাংলাদেশে KOICA-র সহায়তা

প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া সরকার বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক মডেলে গড়ে তোলার জন্য দেশটির দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে বিনিময় করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বেশ কতিপয় ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেশ করার সময় এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ। অপর দিকে

বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে। এখানে দুই দেশের মধ্যে যে মিল লক্ষ্য করা যায় তা হলো দু'দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছিল কেবলমাত্র বিদেশী অনুদান বিলম্বে আসার কারণে। তবে দক্ষিণ কোরিয়া এসব বিদেশী অনুদান ও সহায়তা প্রাথমিকভাবেই শিল্পায়ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে অপর দিকে বাংলাদেশ আগ্রহী ছিল শিল্পায়ন ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের। ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিদেশী বিনিয়োগ ও অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা অর্থের অধিকাংশই আসে Official Development Assistance (ODA) এবং Foreign Direct Investment (FDI) নীতির মাধ্যমে।

১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা থেকে বাংলাদেশে ODA সহায়তা আসতে থাকে। এসব সহায়তার সিংহভাগ আসত দুর্গত ও দারিদ্র্য পীড়িত মানুষের সহায়তা হিসেবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের প্রতি বিদেশী সহায়তার এই ভাবমূর্তি অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে প্রকল্প খাতে সহায়তামূলক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৩ সাল থেকে। এ সময় কিছুসংখ্যক বাংলাদেশীকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে এই সহায়তামূলক কার্যক্রম শুরু হয়। তবে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহায়তা দান কর্মসূচি তখনও জোরদার ছিল। প্রকৃত পক্ষে, বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ, বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ সব থেকে বেশী আসে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে। এসব সহায়তার অধিকাংশই সরকারি উন্নয়ন সহায়তার অংশ হলেও এর সাথে প্রকল্প ভিত্তিক সহায়তাও অব্যাহত থাকে।

বিকেন্দ্রীকরণ খাতে ODA সহায়তা

বাংলাদেশের স্থানীয় ও গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ জনগন দরিদ্র এবং এসব জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯০ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে কোরিয়ার সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি উন্নয়ন সহায়তার সমস্ত অর্থই বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয় যার মধ্যে ৫.৫ শতাংশ ব্যয় করা হয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে। এছাড়া ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের কিছু কিছু জনপদের মানুষ বেশি দরিদ্র এবং শহর থেকে অধিক দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে অধিক জনসংখ্যা অধ্যূষিত কতিপয় এলাকায় ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে বিলম্ব

হয়। এজন্য কোরিয়া সরকার নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঢাকার বাইরের জনপদের দূর্গত জনগনকে ত্রাণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই পদক্ষেপের অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে ঢাকার বাইরে অবস্থিত বিভিন্ন এলাকা, যেমন- সাভার, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, প্রভৃতি স্থানে অধিক পরিমাণে ODA সহায়তা প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার আরো অধিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিৎ, তাহলে বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো আরো উন্নত হবে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ স্বাবলম্বী দেশ হিসেবে বিশ্বে মাথা উচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

KOICA-র গ্রহণযোগ্য পরামর্শ প্রদান

আলোচ্য অধ্যায়ে KOICA-র অধীনে পরিচালিত কোরীয় ODA সহায়তা ও অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বে দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং OECD সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হবে। এখানে DAC/OECD-র সহায়তায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুটি ধারা, যেমন-'Local Ownership' বা স্থানীয় পর্যায়ের মালিকানাস্বত্ব এবং 'Partnership' বা অংশীদারিত্ব শব্দ দু'টিকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে। নতুন এ শব্দ দু'টির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উয়ুন সুন সিম (Yoon Sun Shim) লিখেছেন, æShows meaningful metrics for determining progress to reacess the duties and responsibilities of both donor and recipient countires."[১৪]

আন্তর্জাতিকভাবে, দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহযোগিতার পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই সহযোগিতার পরিমান চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার পরিমান আরো বৃদ্ধির জন্য দক্ষিণ কোরিয়াকে আহবান জানিয়েছে। ১৯৬০ এর দশক থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া সহযোগিতার দ্বার উন্মোচন করে এবং বলা যায়, তখন থেকেই দেশটি এর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এসময় কোরিয়া একদিকে ছিল সাহায্যগ্রহীতা দেশ এবং অপরদিকে সাহায্যদাতা দেশ হিসেবেও বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। মূলত: এখান থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া তার ODA সহায়তা সংক্রান্ত কর্মসূচির ধারণা লাভ করে। অর্থাৎ বিগত বছরগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়া তার উন্নয়নের জন্য যে সহায়তা গ্রহণ করেছিল পরবর্তীতে তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যে, একইভাবে উন্নয়নশীলদেশগুলোতেও উন্নয়নমূলক কার্মকান্ডে সহযোগিতা দান করা।

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা

দক্ষিণ কোরিয়া একটি উন্নত দেশ। দেশটিতে মানব সম্পদ ব্যবহার করার মত যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, বিধায় দেশটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে মানব সম্পদ আমদানি করে ঐসব দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে অভাবনীয় অবদান রেখে চলেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় KOICA-র সহায়তায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নশীল দেশের মানব সম্পদ প্রশিক্ষণের কর্মসূচি থেকে। এছাড়াও উন্নয়শীল দেশগুলোতে কোরিয়ার স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ প্রভৃতি কর্মসূচি থেকেও এই সহায়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে কোরিয়া সরকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন, সংস্কার ও পুনর্গঠনে সহায়তা দান করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সম্পদ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ যাতে দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে সেজন্য দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা দান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, কোরিয়ার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের মানব সম্পদ যথেষ্ট দক্ষ ও কর্মপোযোগী হয়ে উঠেছে যা বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরন ও তাদের কর্মসংস্থানে অসামান্য অবদান রেখেছে। অধিকন্তু বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশ বিধায় কোরিয়া সরকার তার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সহায়তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে। কোরীয় সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত খাতকে। এছাড়া মানব সম্পদকে কর্মপোযোগী সম্পদে পরিণত করার জন্যও KOICA অসামান্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।[১৫]

KOICA-বাজার উপযোগী পণ্য পরিবহন ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশকে সহায়তার পরিমান আরো জোরদার করেছে যাতে স্থানীয় প্রয়োজন ও অবস্থান অনুযায়ী ODA সহায়তাকে দ্রুত কাজে লাগানো সম্ভব হয়। এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে KOICA যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ODA সহায়তাকে গাইড লাইন হিসেবে ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, এভাবে KOICA যদি বাংলাদেশের প্রতি এর এ সহায়তামূলক কর্মসূচির ধারা অব্যাহত রাখে তাহলে বাংলাদেশ নিকট ভবিষ্যতে পুরোপুরি স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এবং এর ফলশ্রুতিতে যোগ্য সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ গণতান্ত্রিক অবস্থা ও পরিবেশ বিকাশ সাধিত হবে।

KOICA-র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

KOICA-র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে স্বল্প পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এ প্রসঙ্গে KOICA-র সাবেক পরিচালক স্যাং তে কিম লিখেছেন, æThere is, however, a general agreement that Korean development has been achieved through a very compressed process, in which the Korean government has played the most critical role taking advantage of its abundant human resources.”[১৬] এছাড়া বাংলাদেশে KOICA-র সহযোগিতার অংশ হিসেবে কোরিয়া সরকার বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আধুনিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতি বছর KOICA বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বহুসংখ্যক কর্মচারি ও কর্মকর্তাকে এ দেশের প্রতিষ্ঠান থেকে সিউলে আমন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় অফিস ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরন পদ্ধতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরকারি কর্মচারি, আবহাওয়াবিদ, ভূগোলবিদ, ভাষাতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নবিদসহ আরো বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গকে KOICA-র পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। এভাবে KOICA-র সহযোগিতায় কোরীয় প্রশিক্ষণ বাংলাদেশে আধুনিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের বিকাশ সাধন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

বাংলাদেশে কোরীয় EDCF ঋণ সহায়তা প্রদান

১৯৮৭ সালের ১ জুন দক্ষিণ কোরিয়া Economic Development Cooperation Fund (EDCF) নামক একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত তহবিল প্রতিষ্ঠা করে। এই তহবিলের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে EDCF এর ‘Annual Report’-এ বলা হয়, æ………help developing countries promote industrial growth and improve economic stability as well as to encourage development of a sound economic relationship between recipient countries and Korea.” [১৭] তবে EDCF ঋণ সহায়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় দক্ষিণ কোরিয়ার উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মি.ওকিয়্যু

কেউন (Mr.Okyu Kwon)-এর বর্ণনায়। তিনি ২০০৭ সালের ৪ জুলাই EDCF এর ওপর সিউলের হোটেল শীলাতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন যে, æAs we graduated from the international development assistance program, we set up the EDCF in 1987 to return the generous favor we received to other development partnership countries. As of July 2007, we have extended total US $ 82.8 billion to 155 projects in 41countries."[১৮] এই সম্মেলনে আরো ঘোষণা করা হয় যে, ২০০৮ সাল থেকে উন্নয়ন সহযোগিতার অংশ হিসেবে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হবে। তবে এসব দেশকে কোরীয় সরকারের আদর্শ অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করতে হবে। এসময় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশ সমূহের প্রতিনিধিগণ কোরীয় সরকারের আদর্শ অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। এদিকে কোরীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোরীয় EDCF-এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, æ.........rich experience of successfully fostering human capital through science and technology education and vocational training."[১৯] এছাড়া এসময় EDCF-এর সহায়তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যবহার করার জন্য সহযোগী দেশগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে EDCF সহায়তা কার্যক্রম বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদানের প্রথা চালু করা হয়েছে। এসব প্রকল্প এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। EDCF-এর পক্ষ থেকে এসব প্রকল্প পরিচালনা প্রসঙ্গে EDCF এর International Conference-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন দেশে EDCF-এর যে সমস্ত প্রকল্প চালু আছে সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, æRoad construction projects in China, Srilanka, and Indonesia, Telecommunications and network expansion project in Mongolia, Bangladesh and Uganda, Vaccine plant construction projects in Vietnam and Myanmar, vocational education and university development project in Laos and Uzbekistan, a hydroelectric project in Nepal, and a wastewater treatment project in Jordan."[২০] এখানে আরো বলা হয় "..........by providing more effective aid EDCF intends to help allevation

of poverty and materialize the principles embodied in the MDGs of 2000, Paris Declaration of 2005, and the high level-Level Forum on Harmonization in Rome in 2003".[২১] ১৯৯৭ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে EDCF ঋণসহায়তা সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে EDCF ঋণসহায়তা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়। এই ঋণসহায়তা কোরীয় Export-Import Bank এর মাধ্যমে লেনদেন হবে বলে ঘোষণা করা হয়।[২২]

EDCF ঋণের নিয়ন্ত্রাণাধীনে নির্মিত ও পরিচালিত প্রকল্পসমূহ

EDCF ঋণ সহায়তা চুক্তির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া সরকার বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগসহ ৫টি প্রকল্পে EDCF ঋণসহায়তা দানের আশ্বাস প্রদান করে। এসব প্রকল্পের মধ্যে কতিপয় প্রকল্প এখনো কোরীয় Exim Bank অনুমোদন করেনি, কতিপয় প্রকল্প অতি সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে এবং বেশ কিছু প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। তবে EDCF ঋণ সহায়তা বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেন যে, অন্যান্য দেশ, যেমন–ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশে এই ঋণ সহাতার পরিমাণ খুবই কম এবং প্রকল্প খাতে প্রদত্ত অর্থ প্রদানের পরিমাণও নগণ্য। তবে এই সহায়তা এই অর্থে ভাল বলে বিবেচিত হয় যে, এসব অর্থের অধিকাংশই অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হবে যা সরাসরি উৎপাদনমূলক কাজে উৎপাদনে সহায়তা করবে। এভাবে EDCF ঋণ সহায়তা বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভীত রচনা করবে যা বাংলাদেশের জনগণের জীবন যাত্রার মানকে আরো উন্নত করবে। এছাড়া কারিগরি প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, যোগাযোগ এবং পণ্য আদান-প্রদান, পরিবেশ উন্নয়ন, টেলিযোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহসহ প্রভৃতিখাতে বাংলাদেশকে ২০১৫ সালের মধ্যে Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনে সহায়তা করবে। অধিকন্তু EDCF ঋণ সহায়তা বাংলাদেশকে এর নিজস্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণসহ নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে স্বকীয়তা অর্জনে সহায়তা করেছে।[২৩] এভাবে EDCF ঋণ সহায়তা ত্রান সহায়তার মত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন খাতে সাফল্য বয়ে এনেছে যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে আরো উন্নতরূপ দান করার পাশাপাশি দক্ষ নেতৃত্ব প্রদানে সহায়তা করবে এবং

এভাবে বাংলাদেশকে আলোকবর্তিকার পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তথ্য নির্দেশ:

১. World Bank(1998), *Assessing Aid : What Works, What Doesn't, and Why?* (London:Oxford University Press) p6. ODA-র আরো সংজ্ঞার জন্য দ্রষ্টব্য, DAC, OECD(1999)," Is This Aid?" /OECD.

২. একটি সাহায্যদাতা দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উত্থান সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, Sang Tae Kim (2003), *ODA Policy of the Republic of Korea : In Context of its Evolving Diplomatic and Economic Policies* (Seoul: KOICA), pp,l-30; also, Ministry of Foreign Affairs and Trade, ROK (2000), *Koreas ODA* (Seoul: MOFAT), pp,8-114, দ্রষ্টব্য; Jungpil CHOI (2006), "Worldwide ODA Activities: Korea's Future ODA Policy" M.A Thesis, GSIS, Korea University,pp73-179; দ্রষ্টব্য, Kim Yang Mi (2000),"Korea's Official Development Assistance: New Strategies for Development Cooperation " M.A. Thesis, Ewha Womans University,pp,6-l15. দ্রষ্টব্য, Yoon-Sun Shim(2000), "Korea's Official Development Assistance: Trends and Strategies with an Emphasis on Assistance to Vietnam," Masters in International Cooperation Thesis, GSIS, Yonsei University,pp,l6-125 এবং আরো দ্রষ্টব্য, Sang Eun Eee(2003), "The Role of Korea's ODA: Bridging the Digital Divide in Developing Countries", Master of International Studies, GSIS, Ewha Womans University Seoul,ROK, pp,l5-120.

৩. প্রাগুক্ত

৪. Yoon-Sun Shim,"Korea's ODA",p20.

৫. Wendy Harcourt(1997), "Development" *in Journal of the Society for International Development* Vol. 4,

৬. Hyun-Sik Chang, Arthur M. Fell and Michael Baird (1998), *A Comparison of Management Systems for Development Cooperation in OECD/DAC Members* (OECD: Paris),p 25.

৭. Yoon-Sun Shim," Korea's ODA" pp,21-22.

৮. প্রাগুক্ত

৯. প্রাগুক্ত

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. KOICA,"KOICA-*Annual Report*",1998.

১৩. Ministry of Foreign Affairs and Trade, ROK (1999),"Background Notes: Vietnam", October,1999.

১৪. Yoon-Sun Shim," Korea's ODA", p 58.

১৫. প্রাগুক্ত, p. 59.

১৬. Sang Tae-Kim(2004), “Promoting International Cooperation Through International Training Programs," (KOICA, July 2004).

১৭. Eximbank of Korea, EDCF *Annual Report*, 1998,pp25-26; এছাড়া EDCF ঋণ: বরাদ্দ প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা ও কার্যকারিতার জন্য দ্রষ্টব্য, Kim Yang Mi (2000), "Korea's Official Development Assistance: New Strategies for Development Cooperation", [M.A. Thesis, Ewha Womens University, Seoul, Korea], pp21-24.

১৮. EDCF, *International Conference Proceedings* 2007,p-14.

১৯. প্রাগুক্ত, p-15.

২০. প্রাগুক্ত, p-14.

২১. আরো অধিক বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত, p 21.

২২.প্রাগুক্ত

২৩. Chang Jae Lee, (Vice President KIEP),"Korea's Experience in Development Cooperation ". p 70.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া বাণিজ্যিক সম্পর্ক, ১৯৭৩-২০০৭

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আদান-প্রদান বা লেনদেন একুশ শতকের আন্তর্জাতিক কূটনীতির একটি অপরিহার্য উপাদান এবং দক্ষিণ কোরিয়া-বাংলাদেশ সম্পর্ক এ প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষভাবে ভিত্তিশীল। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়। এ চুক্তিটি প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। এই চুক্তির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে পাটজাত সামগ্রী, সেলাইজাত পণ্য, তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী এবং হিমায়িত ও অন্যান্য পণ্য আমদানি করে। অন্যদিকে কোরিয়া বাংলাদেশে অটোমোবাইল, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রিক সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সামগ্রী, তন্তু প্রভৃতি রপ্তানি করে। ইতোপূর্বে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে স্বাক্ষরিত Asia Pacific Trade Agreement (APTA)-এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশসহ বিভিন্ন অনুন্নত দেশের সামগ্রীর ৮০ শতাংশ শুল্ক মওকুফের ব্যবস্থা করেছে। তবে বাণিজ্যিক ভারসাম্য সবসময়ে কোরিয়ার অনুকূলে থাকায় বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি পরিমাণ পণ্য আমদানির জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করে আসছে।[১]

কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ব্যক্তি পর্যায়ে বেশ কতিপয় সফর বিনিময় হয়। বর্তমানে প্রায় ২০,০০০ বাংলাদেশী দক্ষিণ কোরিয়াতে এবং প্রায় ১৫০০ কোরীয় নাগরিক বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। বিগত ৩০বছরে দু'দেশের মধ্যে উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশ কতিপয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যে গুলোর আওতায় উভয় দেশ সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, অর্থনৈতিক, আইন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এছাড়া দু'দেশের প্রতিনিধিরা তাদের দূতাবাসগুলোর কর্মকান্ডের মাধ্যমে উভয় দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে জোরদার করে চলেছেন।[২] একই প্রক্রিয়ায় উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি ও উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industries (FBCCI)-এর সভাপতি জনাব এ.কে. আজাদ সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তব্য দান

কালে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগের একটি চিত্র তুলে ধরেন। বক্তৃতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ায় যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করছে সেসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জনাব তাই ইয়াং চো (Taiyoung Cho). তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলাদেশ সরকার, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য বাংলাদেশী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিৎ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করা। তাহলে অতি সহজেই বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করাসহ অর্থনৈতিকভাবে দেশটি দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হবে। এসময় Korea-Bangladesh Economic Cooperation Committee-র চেয়ারম্যান জনাব কিহাক সুং (Kihak Sung)ও বক্তব্য রাখেন। তাঁর ভাষায়, বাংলাদেশের সকল পর্যায়ে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'Competition is everywhere, even in attracting FDIS'.[৩] সম্মেলনে কোরীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি জনাব তাই ইয়াং চো উল্লেখ করেন যে, বিগত ১৫ বছর যাবত দু'দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের উভয় দেশ সফরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার লেনদেন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ কোরিয়া একটি উন্নত রাষ্ট্র এবং বাণিজ্যিক দিক দিয়ে দেশটি যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ একটি রাষ্ট্র এবং পুরোপুরি স্বাবলম্বী নয়। সুতরাং বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার হলে দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে বাংলাদেশই বেশি লাভবান হবে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সভাপতি এ.কে আজাদ খান বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ দ্রুত বাজার সৃষ্টিকারী ও সম্ভাবনাময় একটি দেশ। তাঁর মতে এ কারণে বাংলাদেশ সবসময় দক্ষিণ এশিয়া ও Association of South-East Asian Nations (ASEAN)-ভূক্ত দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত রেখে চলতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া ভৌগোলিকভাবে দেশটি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত হওয়ার দরুণ বাংলাদেশ সকল উন্নত দেশের বিনিয়োগকারীদের কাছে সবসময় আকর্ষনীয় প্রতীয়মান হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রতি উদার মনোভাবও এক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক উপাদান হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। বাংলাদেশের সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের অনেক সহজ শর্তে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান করে থাকে এবং বিদেশীদের শতকরা ১০০ভাগ মালিকানা প্রদান, কর মওকুফ দিবস পালন, মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস, যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সহযোগিতা এবং মূলধন বিনিয়োগে

শতভাগ আস্থার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।[৪] অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ার তৃতীয় এবং বিশ্বের ১৩তম অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশ। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে প্রায় ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারমূল্যের সহায়তামূলক কর্মসূচিতে অর্থ ব্যয় করেছে,যদিও কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বর্তমান অবধি এই বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশি নয় বলে চৌ মত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো আশা প্রকাশ করেন যে, কোরীয় সরকার খুব দ্রুত বাংলাদেশে আরো অধিক বিনিয়োগ করবে যাতে বাংলাদেশ তার বার্ষিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ৬-৭ শতাংশ এখাত থেকে পুষিয়ে নিতে পারে। তিনি বলেন যে, এটি সম্ভব হলে বিশ্বের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এ সম্পর্কে তিনি বাংলাদেশে অবস্থিত কোরীয় EPZ-এর কথা উলে ø খ করেন এবং বলেন যে, দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে EPZ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে যথেষ্ট সহায়তা করে চলেছে এবং এ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট শক্তিশালী করতে অবদান রেখেছে। উলে ø খ্য যে, বাংলাদেশে কোরীয় EPZ স্থাপনের ফলে প্রায় ৩৫০,০০০জন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিবছর EPZ গুলো থেকে মালপত্র বিদেশে রপ্তানি খাত থেকে প্রায় ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়ে থাকে। জনাব চৌ এর মতে, দু'দেশের সরকার যদি আরো ১৫বছর আগে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করত তাহলে EPZ প্রকল্পের মাধ্যমে দুটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে আরো লাভবান হতে পারতো। এ সময় তিনি বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন যে এখনো যদি বাংলাদেশ সরকার বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষনীয় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্র তৈরি করে তাহলে নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভাল অবস্থানে পৌছাতে সক্ষম হবে। এছাড়া বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরীয় EPZ ইয়াংগানে কর্পোরেশনের (Youngone Corporation) চেয়ারম্যান জনাব সুং গি হ্যাক (Sung Gi Hak) বলেন যে, বাংলাদেশের উচিৎ বিদেশী ব্যবসায়ীদের প্রতি আরো উদার মনোভাব প্রদর্শন করা এবং বিদেশী বণিক শ্রেণীর সাথে নতুন নতুন বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করা। তাঁর মতে, বাংলাদেশ সরকারের উচিৎ হবে বিনিয়োগের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা এবং এখানে বিদেশীদের বিনিয়োগের জন্য আগ্রহ তৈরি করা। তাঁর মতে, শিল্পায়নের যুগে বহু বিদেশী বিনিয়োগকারীগোষ্ঠী তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে চলেছে এবং বাংলাদেশ এসব অনুসন্ধানকারী গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে তাদেরকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে পারে।[৫]

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা কাটিয়ে ওঠা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার শিল্পায়ন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ প্রক্রিয়ায় বিদেশী বিনিয়োগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে বাংলাদেশের সরকার শিল্পায়ন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য 'Open Door Policy' বা 'উম্মুক্ত দ্বারনীতি' গ্রহণ করে। এভাবে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও প্রসার এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের শিল্পায়ন ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশ বলে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Export Processing Zones Authority) বা BEPZA বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ জোন বা Export Processing Zones (EPZ) স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করে।[৬]

এভাবে ১৯৮০ সালে প্রণীত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের Act of Parliament অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর তীরে কোরীয় EPZ স্থাপিত হয়। এটি KEPZ বা Karnafuli EPZ নামে পরিচিত।[৭] এই EPZ টি দেশের বৃহৎ শিল্প কারখানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই কারখানাটি পোশাক তৈরি খাতে বেশি আগ্রহ দেখালেও পরবর্তীতে কোরীয় মালিক এখানে নতুন ধরণের জুতা তৈরি ও উদ্ভাবনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ সময় ইয়াংগানে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, প্রায় ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে ২৫০০ একর জমির ওপর কোরীয় জুতা প্রস্তুতকারী কারখানা স্থাপন করা হবে এবং তা বিশ্বের বৃহত্তম জুতা প্রস্তুতকারী কারখানা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।[৮] এসময় KEPZ এর জেনারেল ম্যানেজার লে. কর্নেল মোঃ শাহাজাহান বলেন, The Seoul based company ….. also the country`s top garment maker …… would create more than 32,000 jobs in the gaint 72–production hines factory. তিনি আরো লিখেছেন, “It will be one of the world`s largest shoe complex. It will make Bangladesh a major foot ware exporter in the global market.”[৯] ইতোমধ্যে ইয়াংগানে কর্পোরেশন জুতা প্রস্তুত ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় জুতা প্রস্তুতকারী কোম্পানি, যেমন- Nike, Polo, Ralph, Laurevs,

Puma, Eddie Bauer Adidas প্রভৃতির সমমর্যাদা অর্জন করেছে এবং এখানে প্রায় ৬ মিলিয়নেরও বেশি জোড়া জুতা প্রস্তুত করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ১৯৯৯ সালে ইয়াংগানে কর্পোরেশনে KEPZ স্থাপনের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করে এবং প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক অবকাঠামো নির্মাণ খাতে ব্যয় করে। এভাবে প্রতিষ্ঠানটি চারটি ব্লকে বিভক্ত হয়ে অনেকগুলো শক্তিশালী নির্মাণ কারখানা বা প্লান্ট স্থাপন করে। এসব প্লান্ট স্থাপনের পর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে একথা জোরালোভাবে প্রচার করা হতে থাকে যে, এসব প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশীদেরকে তাদের কোম্পানিতে আরো বেশী বিনিয়োগ করতে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় বার্ষিক ১.২৫বিলিয়নেরও বেশি মার্কিন ডলার আয় করা সম্ভব হবে। এভাবে ইয়াংগানে কর্পোরেশন KEPZ-এ প্রায় ৩৫০,০০০ কর্মসন্ধানী মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়।[১০] এছাড়া কোরীয় বিনিয়োগকারী এসব গোষ্ঠী কর্ণফুলী নদীতে জাহাজের পোতাশ্রয় নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তবে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেন যে, পর্যাপ্ত গ্যাসের অভাবে প্রকল্পটি দ্রুত বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে না, যদিও বাংলাদেশ সরকার এর বিকল্প হিসেবে কোন জ্বালানী সরবরাহ করতে সক্ষম হচ্ছে না।[১১]

এই জুতা প্রস্তুতকারী কারখানাতে প্রতিদিন প্রায় ২.৭৫ বিলিয়ন কিউবেক ফিট গ্যাসের প্রয়োজন অথচ চাহিদার তুলনায় এখানে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ খুবই নগণ্য।[১২] এভাবে KEPZ-এর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় গ্যাস ও জ্বালানী সরবরাহ করা গেলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বড় ধরণের খাতে রূপান্তরিত হবে। KEPZ-এ গ্যাস ও জ্বালানী সংকট মোকাবেলার করার জন্য BEPZA কর্তৃপক্ষ ২০০৮ সালে আমেরিকান বিদ্যুৎ ও জ্বালানী শক্তি উৎপাদন কোম্পানি Malancha Holdings Limited (MHL)-এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির আওতায় MHL কোম্পানি চট্টগ্রাম ও ঢাকা EPZ-এ ৪০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কথা অঙ্গীকার করে। আবার ২০০৮ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রামে অবস্থিত কোরীয় EPZ কর্তৃপক্ষের সাথে BEPZA অপর একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির আওতায় কোরীয় EPZ-কে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের নিমিত্তে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা /প্লান্ট স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। এ সময় MHLকোম্পানি ২০০৯ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে এবং কোরীয় EPZ কর্তৃপক্ষ পরের বছর তাদের কার্যক্রম শুরু করার কথা ঘোষণা

করে।[১৩] এভাবে ক্রমান্বয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত EPZ-এ জ্বালানীশক্তি হিসেবে অফিস চলাকালীন সময়ে ৩০ মেগাওয়াট এবং অবশিষ্ট সময়ে১০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এ সময় BEPZA কর্তৃপক্ষ ঘোষণা প্রদান করে যে, "We can supply the surplus power to the national grid easily and minimize Chittagong's power crisis to some extent."[১৪] এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও কোরীয় EPZ-এ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংকট অব্যাহত থাকে এবং কোরীয় EPZ কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করে যে, পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত থাকলে তারা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রায় ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে সক্ষম হতো। এসময় কোরীয় EPZ কর্তৃপক্ষ *The Daily Star* পত্রিকাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ".......it was eager to invest for 1,000MW power plant at the EPZ site if the government could ensure gas supplies."[১৫] তবে বাংলাদেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী সংস্থা পেট্রোবাংলার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, "....the country will continue to face at least 200mmcfd gas supply shortfall this year and situation will continue to worsen."[১৬] এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার উদ্ভুত গ্যাস সংকট অতি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস প্রদান করে এবং ঘোষণা করে যে, ৪০-৫০ কোটি টাকা ব্যয় করে আশুগঞ্জ ও বাখরাবাদের তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র থেকে পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রামে গ্যাস সরবরাহ করা হবে, যা আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ (AB) প্রকল্প নামে পরিচিত।[১৭] বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত এই প্রকল্পটি খুব বেশি সফলতা লাভ করতে পারেনি এবং কোরীয় EPZ কর্তৃপক্ষ এজন্য পেট্রোবাংলাকে দায়ী করে এবং অতি দ্রুত গ্যাস সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে।

EPZ-গুলোর বাণিজ্যিক কর্মকান্ড ও এর সফলতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত আয়ের উৎস হিসেবে EPZ-এর রপ্তানি কার্যক্রম একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে। এটি দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি কাঁচামালের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং জনশক্তিকে দক্ষ করে তোলা ও তা যথাযথভাবে কার্যোপোযোগী করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে থাকে।[১৮] বর্তমানে বাংলাদেশে EPZ-এর সংখ্যা ৮ টি এবং এগুলো হলো, চট্টগ্রাম (১৯৮৩), ঢাকা (১৯৯৩), মংলা (১৯৯৮), ঈশ্বরদী (১৯৯৮), উত্তরা (১৯৯৯), কুমিল্লা (২০০০),আদমজী (২০০৬), এবং কর্ণফুলী ই.পি.জেড (২০০৬) প্রভৃতি।[১৯]

বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক তৎপরতা অধিক সুষ্ঠভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এশিয়ার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশ সরকার আরো অনেক দেশের সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করেছে যার অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা SAARC-ভূক্ত দেশসমূহের সাথে সম্পাদিত হয়েছে। তবে এসব বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায় সব থেকে বেশি প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকাকে। আবার এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ার সাথেও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর রয়েছে।

এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক চুক্তি

বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নের স্বার্থে বাংলাদেশ বিভিন্নদেশ ও সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকে। প্রতিবেশী দেশ যেমন, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা প্রভৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থা যেমন, BIMSTEC, SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA), The Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA), SAARC Framework Agreement on Trade in Services (SAFAS) সহ Asia-Pacific Trade Agreement (APTA) প্রভৃতি সংস্থার সাথে বাংলাদেশ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।[২০] এভাবে ১৯৭৫ সালে ব্যাংকক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে বাংলাদেশ এর সদস্যপদ লাভ করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ছাড়াও যেসব দেশকে সদস্যভূক্ত করা হয় সেগুলো হলো ভারত, শ্রীলংকা, চীন, প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া এবং প্রজাতন্ত্রী লাওস প্রভৃতি।[২১] পরবর্তীতে নেপাল ও ফিলিপাইনকেও সংস্থাটির সদস্যভুক্ত হয়েছে।[২২] ২০০৬ সালের ১ জুলাই ব্যাংকক চুক্তির নাম পরিবর্তন করে Asia Pacific Trade Agreement (APTA) বা এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক চুক্তি নামকরণ করা হয়েছে। APTA চুক্তির উদ্দেশ্য হলো চুক্তি স্বাক্ষরকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক শুল্ক হ্রাসকরণ। অর্থাৎ এই চুক্তির আওতায় সদস্য রাষ্ট্রগুলো পারস্পরিকভাবে ইতোমধ্যে আরোপকৃত উচ্চহারের বাণিজ্যিক শুল্ক প্রত্যাহার করে নিয়েছে। অপরদিকে দক্ষিণ কোরিয়া ১০টি পর্বে ১৩৯টি পণ্যের ওপর থেকে সকল প্রকার বাণিজ্যিক শুল্ক অর্থাৎ চীনের মত শতভাগ শুল্ক প্রত্যাহার করেছে।[২৩] এভাবে ২০০৬ সালে তৃতীয় বারের মত বাণিজ্যিক চুক্তিটির ওপর আলাপ-আলোচনার জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সম্মেলনের সকল সদস্য রাষ্ট্র উপস্থিত থাকলেও তা খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অর্থাৎ, সকল সদস্য

রাষ্ট্রের উপস্থিতির পরও সম্মেলনটি কিছুটা এলোমেলোভাবে আয়োজিত হয় এবং চুক্তিটির সংশোধন, উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য তা কোন গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। এরপর ২০০৭ সালের ২৬ অক্টোবর ভারতের গোয়াতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রীপর্যায়ের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে চতুর্থ বারের মত APTA চুক্তির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এখানে দ্বিতীয় পর্বের বিনাশুল্কে বাণিজ্যের বিষয়টি প্রত্যাহার করা হয় এবং বেশকিছু বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গোয়া সম্মেলনে যেসব বিষয়কে প্রাধান্য দান করা হয় তা হলো, বিনা শুল্কে পণ্য প্রবেশাধিকারের পরিবর্তে শুল্কহার হ্রাসকরণ, বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক সেবা বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়ের ধরণ ও প্রকৃতি প্রভৃতি। বাংলাদেশ এসব কর্মকান্ডকে সানন্দে গ্রহণ করেছে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্রের সাথে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। এসময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাণিজ্যিক চুক্তির কাঠামো, বাণিজ্যিক সেবা, বিনিয়োগ এবং এর প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় কেমন হবে তা উপস্থাপন করার আহবান জানায়।[২৪]

APTA চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সদস্যভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক নির্ধারণ নিয়ে বিশৃংখল অবস্থার সূচনা হলে বাংলাদেশ এর পণ্যের ওপর শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য চীন, দক্ষিণ কোরিয়া এবং লাওস-এর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় মিলিত হয়। এসময় বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রী লাওসের প্রতি বাংলাদেশের যেসব পণ্যের ওপর থেকে লাওস প্রজাতন্ত্র শুল্ক প্রত্যাহার করতে আগ্রহী তার একটি তালিকা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু প্রজাতন্ত্রী লাওস বাংলাদেশকে কোন তালিকা প্রদান করতে রাজী হয় নি। এসময় ১০৫৮টি শুল্কযুক্ত পণ্যের ওপর থেকে চীন ৫০%শুল্ক প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রদান করে। উলেøখ্য যে, চীন বিশ্বের সব দেশকে এই ঘোষণার আওতায় ১০৫৮টি পণ্যের ৫০শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের সুযোগ প্রদান করে। কিন্তু এই ঘোষণা কম আয়ের দেশসমূহের জন্য বিশেষ কোন ছাড় ছিল না। এসময় বাংলাদেশ চীনকে বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য আবারো অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশ চীনকে ৭৮টি পণ্যের একটি তালিকা প্রদান করে যাতে ৩০শতাংশ থেকে ৭০শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য আহবান জানানো হয়। একইভাবে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার প্রতি শুল্ক প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অনুরোধ করেনি এবং দক্ষিণ কোরিয়াও এ বিষয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে। কারণ পূর্বেই উভয় দেশ একটি আলোচনায় সম্মতি প্রকাশ করে যে, কমিটির ৩২তম অধিবেশনে পারস্পরিক পণ্য বিনিময়ের একটি তালিকা প্রদান করবে। এসময় বাংলাদেশ, ভারত ও শ্রীলংকা তাদের পণ্য বিনিময় সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভায় মিলিত হয় এবং এখানে বলা হয় যে, কমিটির ৩০তম অধিবেশনে তারা কোন শুল্ক হ্রাসের জন্য

আবেদন করবে না বরং তারা দক্ষিণ এশীয় অগ্রধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি বা South Asia Prefencial Trade Agreement (SAPTA)-র আওতায় APTA চুক্তির প্রয়োজনীয় শুল্ক প্রত্যাহার ও পণ্যের বিনিময় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি দেশ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এতে পণ্যের প্রবেশাধিকার ও শুল্ক হ্রাসের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হবে। এভাবে বিভিন্ন অব্যবস্থা ও অরাজকতার মধ্য দিয়ে চতুর্থ সম্মেলন শেষ হয়। অবশ্য এসময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক APTA-র ৩৪তম অধিবেশন ২০০৯ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে এবং মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনটি ২০০৯ সালের ১৫ডিসেম্বর সিউলে অনুষ্ঠিত হয়।[২৫]

ঢাকা সিউল উন্নয়নমূলক সহায়তা চুক্তি

২০১০সালের ১৬ই মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল সফর করেন এবং ১৮ই মে ২০১০ পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই মে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে উন্নয়নমূলক সহযোগিতা সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে উন্নয়নমূলক সহযোগিতার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক উন্নয়ন, বিনিয়োগ, কারিগরি প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়কে প্রাধান্য দান করা হয়। এছাড়া এসময় উভয় দেশের মধ্যে আরো চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মধ্যে দু'টি চুক্তি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এর একটি হচ্ছে Economic Development Fund Loan (EDFL) এবং অপরটি Energy Cooperation বা দু'দেশের মধ্যে সৌরশক্তি সহায়তামূলক চুক্তি স্বাক্ষর।[২৬]

চুক্তি স্বাক্ষরকালীন সময়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কোরিয়াতে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায় কোটামুক্ত পণ্য প্রবেশাধিকারের অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া এখানে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের অনুরোধ জানানো হয়। এক্ষেত্রে কোরীয় সরকার কোরীয় বাজারে বাংলাদেশী কতিপয় পণ্যের জন্য বিনা শুল্কে প্রবেশাধিকারের আশ্বাস প্রদান করেন, যদিও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের উন্নয়ন খাতে আরো বেশি সহায়তা করার জন্য কোরীয় সরকারকে আহবান জানানো হয়। এ সময় উলেøখ করা হয় যে, কোরীয় সরকার যদি বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে কারিগরি ও সেবাখাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং এসব কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাহলে

বাংলাদেশ কারিগরি ও প্রযুক্তি খাতে আরো উন্নতি লাভ করবে। এ সময় বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশের বিদ্যুত উৎপাদন, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়ন এবং শিল্পকারখানা ও অবকাঠামো খাতে সরাসরি বিনিয়োগ করার জন্য আহবান জানায়।[২৭]

বাংলাদেশ সরকারের আহবানের প্রেক্ষিতে কোরীয় সরকার কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন জোন এবং একটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নখাতে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে। এ ছাড়া বাংলাদেশে কোরিয়ার পক্ষ থেকে EPZ এবং প্রকল্প সহযোগিতার আওতায় যৌথভাবে বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান সংস্থা পেট্রোবাংলা এবং কয়লা ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুত শক্তি উৎপাদন খাতে বিনিয়োগের আশ্বাস প্রদান করে। এমতবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের আহবানের প্রেক্ষিতে কোরীয় সরকার বাংলাদেশকে এ মর্মে আশ্বাস প্রদান করে যে, প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া বাংলাদেশে আধুনিক ও বিলাসবহুল ভবন নির্মাণ, দক্ষ জনশক্তি গঠনে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জাহাজ শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রোতাশ্রয় নির্মাণে সহায়তা দান করবে।[২৮]

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সিউল সফরের সময় দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জোর দাবি উপস্থাপন করা হয়। এ সময় বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ কোরিয়াকে 'বিশেষ বন্ধু রাষ্ট্র' (a special friend state) হিসেবে অভিহিত করেছেন। সিউলে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দাবির পাশাপাশি Employment Permit System(EPS)-এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী জনশক্তির কোটামুক্ত প্রবেশাধিকারের অনুরোধ জানান।[২৯] দু'দেশের সরকারই এতে সম্মত হয় এবং এসময় দু'সরকারই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, জনশক্তি আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে উভয় দেশই উপকৃত হবে যা দু'দেশের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন করবে। এছাড়া দু'দেশের প্রতিনিধিগণ কয়েকটি বিষয়কে নবায়ন করার জন্য আলোচনা করেন। এগুলো হলো জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে সামরিক প্রশিক্ষণ, পারস্পরিক সফর বিনিময়, শিল্প ব্যবস্থপনার উন্নয়ন ও এর বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক সকল অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি প্রভৃতি। সাংস্কৃতিক বিনিময় ক্ষেত্রও এ আলোচনায় স্থান লাভ করে। এতে এ মর্মে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় দেশের মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হবে যা দু'দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্টতর করবে।[৩০]

এভাবে উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান ও উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার জনগন, সরকার, পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক জনগণের মধ্যে এমন এক নিবিড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অবতারনা করেছে যা সম্মিলিতভাবে দুই দেশের বার্ষিক পররাষ্ট্র নীতিসংক্রান্ত আলোচনা (Annual Foreign Policy Consultations) তৈরির সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এ উপলক্ষ্যে উভয় দেশ তাদের পররাষ্ট্রনীতির ৪০ বছর পূর্তি উদযাপনের জন্য ২০১৩ সালকে Korea–Banagladesh FriendshipYear বা "কোরিয়া-বাংলাদেশ বন্ধুত্বের সাল" হিসেবে ঘোষণা করেছে।[৩১] সময়ের ব্যবধানে এ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশী প্রশিক্ষণার্থী, ছাত্র এবং গবেষকদের জন্য শিক্ষাবৃত্তির ব্যবস্থা করেছে এবং বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়া দু'দেশের সরকারই আন্তর্জাতিক পরিবেশ রক্ষায় একসাথে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে এবং আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের বিরূপ আবহাওয়া সংক্রান্ত কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে তার সমাধান করা হবে। এ সময় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে কার্বন নির্গমণ হ্রাস ও সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার জন্য আহবান জানানো হয়। উভয় দেশই কারিগরি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক খাদ্য উৎপাদন, বিদ্যুত শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি, সৌর শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, নদী খনন প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। অধিকন্তু কোরীয় সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়। অপর দিকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asia Association for Regional Cooperation) বা SAARC-এর পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করা হয়।[৩২] যৌথ ইশতেহারে উভয় দেশই আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিষয় যেমন- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, বাণিজ্যিক স্থিতিশীলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস দমন প্রভৃতি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে। আবার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, এসব উন্নয়নমূলক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলো আরো উন্নতি লাভ করবে এবং এভাবে G-২০ সম্মেলন শুরুর পূর্বেই উন্নয়নশীল ও উন্নত রাষ্ট্রের মধ্যে উন্নয়নের সেতু বন্ধন রচিত হবে।[৩৩]

এই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালের ১৬ জানুয়ারি দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় যন্ত্রসংগীত Opera এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত পরিবেশনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে অবস্থিত কোরীয় রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৪০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উৎযাপিত হয়। ৫টি কোরীয় সংগীত দল যেমন, PolicyTenor, Soprano, Cellist, Pianist এবং Flutist তাদের দেশীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানায় এবং দু'দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে আর্বিভূত হয় এবং ১৯৭৮ সালে 'The Korea Trade-Investment Promotion Agency' ঢাকাতে সরকারিভাবে বাণিজ্যিক ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'Strong Demand' নীতি প্রবর্তন করে।[৩৪] সত্তরের দশকেই দক্ষিণ কোরিয়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রদর্শন করে এবং পোশাক তৈরির কারখানা বা গার্মেন্টস্ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। এসব পোশাক তৈরির কারখানার অধিকাংশই এখনো সক্রিয়ভাবে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাকা বেগবান হয়েছে শুধুমাত্র কোরীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কোরীয় পোশাক কারখানা Doewoo Corporation প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন অত্যাধুনিক শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি। এই কর্পোরেশেন 'দেশগামেন্টস্' প্রতিষ্ঠা করে ১৩০ জন বাংলাদেশীকে নিয়োগদানের মাধ্যমে পোশাক শিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পরবর্তীতে এসব শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাংলাদেশী কর্মকর্তাগণ 'দেশগামেন্টস্' পরিত্যাগ করে নিজস্ব মালিকানায় নতুন পোশাক কারখানা স্থাপন করে এবং এভাবে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশ ঘটে।[৩৫]

কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের 'চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনৈতিক সহযোগী দেশ' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া কোরিয়াতে বাংলাদেশী পণ্যের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে শতকরা ৭৫ ভাগ কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করে। অধিকন্তু কোরীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও উন্নয়ন, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন, কারিগরি যন্ত্রপাতি ও জাহাজের পোতাশ্রয় নির্মাণে সহায়তা প্রদান

করে।[৩৬] এদিকে ২০১০ সালের ৬ মে তারিখে প্রকাশিত *The Daily Star* পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বাংলাদেশে নব নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত তাই ইয়াং চৌ বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়ার কার্যালয়ে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার অধিক বিনিয়োগের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। এছাড়া কোরীয় আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষাদান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের আধুনিক কারিগরি জ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা দানের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পায়নের বিকাশ সাধিত হবে বলে চৌ মত প্রকাশ করেন। আলোচনায় কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময়, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা দান এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরনার্থে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাসহ কোরীয় সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের শিল্পায়ন, জ্বালানীখাত এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করা হয়। এসময় শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া এই কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বিনিময়কে স্বাগত জানান এবং এভাবে বাংলাদেশ দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হবে বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, æThis will assist Bangladesh to accelerate its progress to-wards a mid-income country by 2021.”[৩৭] এ সময় তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার দেশে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে অধিক আগ্রহী। এছাড়া তিনি তাঁর বর্ণনায় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট, মাঝারী এবং দীর্ঘমেয়াদী পকিল্পনার কথা তুলে ধরে কোরীয় বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, “Bangladesh is an ideal place for South Korean investments, to incourge the local and foreign investors, the government is setting up special economic zones.” [৩৮] অধিকন্তু তিনি বাংলাদেশের সস্তায় শ্রমিক প্রাপ্যতা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিদেশী বিনিয়োগকারীদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগানোর জন্য কোরীয় বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহবান জানান এবং অতিদ্রুত গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট সমাধান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করা হবে বলে মত প্রকাশ করেন। এ সময় কোরীয় প্রতিনিধি তাইইয়ং চৌ বলেন যে, কোরীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে প্রায় ১৫০টি শিল্প-কারখানা স্থাপন করেছে এবং এসব কারখানায় প্রায় ১ লক্ষের ও অধিক বাংলাদেশী কর্মরত রয়েছে।[৩৯] ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ কোরিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের কারিগরি খাতে বিদেশী বিভিন্ন কোম্পানির অংশগ্রহণের পাশাপাশি কোরিয়ার স্যামস্যাং

টেলিফোন কোম্পানি টেলিযোগাযোগখাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করে যা কারিগরি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করবে এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হবে বলে বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, জ্বালানীখাতে কোরীয় সহায়তার মতো কারিগরি ক্ষেত্রেও এই বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এভাবে সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরো এক ধাপ অগ্রগতি অর্জিত হবে এবং বিশ্ব মানচিত্রে দেশটি সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

তথ্য নির্দেশ:

১. http://www.unescap.org/tid/apta.asp

২. *The Financial Express* (Website-অবলম্বনে)

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

৬. www.bangladeshi EPZs at a glance.com

৭. *National Encyclopedia of Bangladesh*

৮. Ministry of Foreign Affairs, ROK (1997), *Korea's Offical Development Assistance*, Preface.

৯. *The Financial Express*, "Home Page", Dhaka Monday July20,2009. Aslo see: Banglapedia.

১০. প্রাগুক্ত

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. Power projects at Ctg EPZs uncertain for gas crisis suterday, March 8th, 2008 Share on Facebook.
Home>>2008>>march>>Saturday, March 8 >>Power projects at Ctg EPZs uncertain for gas crisis.

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. *The Financial Express*, "Home Page", Dhaka Monday July20,2009. আরো দ্রষ্টব্য; Banglapedia.

১৯. www.bangladeshi EPZs at a glance.com

২০. http://www.mincom.gov.bd/reg_bil_Trade.php.

২১. _^http://www.unescap.org/tid/apta.asp, APTA Website

২২. _^http://www.unescap.org/tid/BAfacts.pdf, APTA Fact

২৩. http://www.mincom.gov.bd/reg_bil_Trade.php

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. http:www.thedailystar.net/newDesign/newsdetails.php?nid=139126.

২৭. প্রাগুক্ত.

২৮. প্রাগুক্ত

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. Home>Bangladesh>Korea celebrating Bangladesh camaraderie Nurul Islam Hasib, Senior Correspondent bdnews24.com (Website অবলম্বনে).

৩৫. প্রাগুক্ত

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. *The Daily Star,* Thursday, May 6, 2010 (Business)

Dhaka University Institutional Repository

৩৮.	প্রাগুক্ত

৩৯.	প্রাগুক্ত

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ, ১৯৮৭-২০০৭

বর্তমান বিশ্বে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে সপ্তম বৃহত্তম পুঁজি বিনিয়োগকারী দেশ এবং বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার অনেকগুলো রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন অঞ্চল বা Export Processing Zone (EPZ) রয়েছে। এছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার ২৬৯ টি সরাসরি ও যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত কোম্পানি বাংলাদেশে ৬১৪.৪২২ মার্কিন ডলার মূল্যের সমান পুঁজি বিনিয়োগ করেছে। এসব বিনিয়োগের প্রধান খাত হচ্ছে কৃষিভিত্তিক পণ্যপ্রক্রিয়াজাতকরন শিল্প, খাদ্য ও খাদ্য সংযুক্ত শিল্প, বস্ত্রশিল্প, ছাপাখানা ও প্যাকেজিং, চামড়া ও রাবার শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাঁচ সিরামিক প্রকৌশল ও সেবামূলক শিল্প প্রভৃতি। এসব শিল্পে এ পর্যন্ত প্রায় ৬৯,২১৪ জন বাংলাদেশীর কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীগণ স্বল্পমূল্যে আবাসগৃহ নির্মাণ, অকাঠ থেকে বোর্ড নির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ ও আইসক্রিম তৈরি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রদর্শন করছে।[1] আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগের লক্ষ্য এবং এই বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি ধরণের ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে তার ওপর আলোকপাত করা হবে। দ্বিতীয়ত ঃ দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা পালন করছে তা আলোচনা করা হবে। তৃতীয়তঃ একুশ শতকের শুরুতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলেও তা বাংলাদেশের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনের ক্ষেত্রে পুরোপুরি অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশ তার Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে কিভাবে এবং কতটুকু কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছে তার ওপরও আলোকপাত করা হবে।

একটি অর্থনৈতিক শক্তিশালী দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার আত্মপ্রকাশ

Economic Super Power বা অর্থনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার আত্মপ্রকাশের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিলগ্নে জাপানের আত্মসমর্পণ ও কোরিয়ায় জাপানী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের

মাত্র ৫০ বছরের মধ্যেই দেশটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে নেয়। এক্ষেত্রে দেশটি কেবলমাত্র তার নিজ অবকাঠামো উন্নয়নেই কাজ করেনি বরং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা World Economic Development-এর ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে Official Development Assistance (ODA), Korean Foreign Direct Investment (FDI) এবং Non Governmental Organizations (NGO)-এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।[2] নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনের পটভূমিকায় দক্ষিণ কোরিয়া এর অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছে এবং এশিয়াসহ অন্যান্য মহাদেশের উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারিগর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমস্যা

ভৌগলিক দিক থেকে বাংলাদেশ হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং দক্ষিণ এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। বাংলাদেশের পূর্ব-পাশ্চিমে ভারত সীমান্ত এবং উত্তর দিকে ভারত বাংলাদেশকে নেপাল সীমান্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। দেশটির দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের বিশাল জলরাশি এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে মিয়ানমার সীমান্ত অবস্থিত।

বাংলাদেশের মোট মাথাপিছু আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ কৃষি, বনায়ন এবং মৎস সম্পদ থেকে আসে। দেশের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, পাট, গম, আলু, চামড়া, তামাক, চা এবং ইক্ষু প্রধান। পাট ও পাটজাত পণ্য, তৈরি পেশাক, ঔষধ প্রভৃতি প্রধান রপ্তানি পণ্য বিবেচিত হয়ে থাকে। এছাড়া চা, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, মাছ, শাকসবজি, সিরামিক, চীনামাটির তৈরি পণ্য প্রভৃতি রপ্তানি করে দেশটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

বাংলাদেশ একটি স্বল্প উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মানুষ দরিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে এবং মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ৪০০ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশকে স্বল্প উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে উপনীত করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ধারা, যেমন-ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি বাংলাদেশ থেকে সূচিত হয়েছে এবং এ পদক্ষেপ বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাকে কিছুটা গতিশীল করলেও তা এখনো পর্যন্ত অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।
এজন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রথম লক্ষ্য হয়েছে দ্রুত

দারিদ্র্য বিমোচন এবং সকল মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নত করা। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে ‘দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত পত্র’ বা ‘Proverty Reduction Strategy Paper’ (PRSP) প্রকাশ করে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকার মনে করে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামোতে দাঁড় করানো সম্ভব। এছাড়া এ PRSP প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরন এবং ত্রাণ সহায়তার আকারে যেসব বিদেশী সহায়তা বাংলাদেশে আসে তা জনগনের মধ্যে সুষমভাবে বন্টন করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের উর্দ্ধতন পর্যায়ের জনৈক কর্মকর্তা জনাব আব্দুল কাদির দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অনুষ্ঠিত কোরিয়ার দশম EDCF সম্মেলনে বক্তৃতাদানকালে বলেন, “Uniquely for a country facing an extreme vulnerable ecology, Bangladesh has established a credible record of susgtained growth within a stable macro-economic farmework.... it has also earned the distinctions of graduating to the medium human group of countrires by UNDP ranking.” তিনি আরো বলেন, “.....the country is not only well ahead in several aspects of human economic progress, but has also been striding ahead in reducing income (related) poverty.”[3] উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রালয় Economic Relation Devision বা ERD-র মাধ্যমে বিদেশী ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

সাধারণত বাংলাদেশ সরকার বিদেশী সহায়তাকে ৪টি শ্রেনীতে ভাগ করে থাকে। এগুলো হলো, খাদ্য সহায়তা, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহায়তা, প্রকল্প সহায়তা এবং কারিগরি সহায়তা। তবে ক্রেডিট সরবরাহ সরাসরি ERD প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ১৯৮৭ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে ঋণ সহায়তাসহ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত সহায়তা PRSP উন্নয়ন খাতে প্রদান করে আসছে।[4] কৃষি ভিত্তিক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে ১৯৮০-র দশক থেকে শিল্প নির্ভর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশক থেকে বাংলাদেশের শিল্লায়ন প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে সদ্য গড়ে ওঠা শিল্প কারখানাগুলোতে ১৯৮০-এর দশক থেকে প্রচুর পরিমান বিদেশী বিনিয়োগ আসতে থাকে।

এসব বিদেশী বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশীয় বিনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। তবে বিদেশী বিনিয়োগ সব থেকে বেশী আসে ইলেকট্রনিক্স খাতে এবং এর ফলে ইলেকট্রনিক্স মার্কেট বাংলাদেশে দ্রুত প্রসার লাভ করে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিদেশী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও বিভিন্ন ধরণের সহায়তাসহ উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এসব বিদেশী বিনিয়োগের ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কিছুটা হ্রাস পায়। এনজিও সমূহের কর্মতৎপরতার ফলে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হয় এবং বেকারত্বের হার হ্রাস পায়। এভাবে বাংলাদেশ বিদেশী দেশগুলোর সাথে সহাবস্থনের মাধ্যমে নতুন প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পায় এবং সমগ্র বিশ্বের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করে। বাংলাদেশের এই বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি বিদেশী দাতাগোষ্ঠীকে খুবই আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এশীয় অর্থনৈতিক মডেলে গড়ে তুলতে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। এভাবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন খাতে ধীরে ধীরে সফলতা আসতে থাকে যে সফলতা বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত শিল্পায়ন নীতি গ্রহণে আরো উৎসাহিত করে।[5]

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিনিয়োগ

সাধারণত বিশ্বের উন্নতদেশের সহযোগীতার ধরণ দুই রকমের হয়ে থাকে, যথা-(১) দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা দান, এবং (২) সরাসরি বিনিয়োগ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও দক্ষিণ কোরিয়া শুরু থেকেই উপরোক্ত দুই ধরণের নীতি এ যাবৎকাল অনুসরণ করে এসেছে। সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে প্রথম সারির পছন্দসই দেশ হিসেবে বিবেচনা করে। বিশেষ করে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেকার সমস্যার সমাধান এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং GDP-র পরিমানও বৃদ্ধি পেয়েছে।[6] অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের দিক দিয়ে বাংলাদেশ প্রায় ১০০টি দেশ এবং অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। তবে যে ১০টি দেশ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে থাকে তার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া বৃহত্তম। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভঙ্গুর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন, ক্রমাগত অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রতিরোধ, খাদ্যসংকট মোকাবেলা করতঃ খাদ্যশস্য আমদানি এবং বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগধারা অব্যাহত রাখা প্রভৃতি বিদেশী সহায়তার ওপর নির্ভরশীল।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ১৯৮০ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময় থেকে দক্ষিণ কোরিয়া নিজস্ব চাহিদা মেটানো, শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যাবলীর পরিধি বৃদ্ধি, নতুন বাজার তৈরি, বাণিজ্যিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি দেশটির সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের সক্ষমতার দ্বার উম্মোচন করে। এ প্রসঙ্গে এস.জে.কিম (S.J. Kim) তাঁর *Effects of Outward Foreign Direct Investment on Home Country: Performance Evidence from Korea* গ্রন্থে লিখেছেন, æSeveral factors such as domestic wages enhancements, increasing amount of labor union activities, search for new markets, trade jumping and technology acquisition may be attributed to this rising trend of outflow of FDI from South Korea."[7] এ ভাবে বিবিধ কারণে দক্ষিণ কোরিয়া সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগনীতি গ্রহণ করে। একইভাবে কোরিয়া কর্তৃক বিদেশে সরাসরি বিনিয়োগ কর্মসূচির ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে সিউলের এহ্ওয়া মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আন মি কিম (Eun Mee Kim) লিখেছেন, "......... MNCs and TNCs from developing countries such as South Korea, seek relatively cheap input costs, better endownment of resources, and demand conditions in less developed countries, as well as access to advanced technology and management know how in advance nations".[8] এ প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার FDI-এর জন্য দায়ী কতিপয় বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন, যেমন-MNCs ও TNCs কে দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য "Positive Global Political Factors" এবং "low transaction costs in the global economic conditions" হিসেবে অভিহিত করছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, "Korean government's intiatives and incentives that promoted globalization and OFDI and relaxaion of governmental regulations, which obstructed OFDI." [9]

আন মি কিম তাঁর লেখনীর মধ্যে কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম ইয়াং সাম-এর (১৯৯৩-১৯৯৮) প্রশাসনামলের বিশ্বায়ন নীতি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার FDI নীতি বেসরকারিখাতে এবং স্বেচ্ছাপ্রনোদিতভাবে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাবে বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, কোরিয়ার

বিনিয়োগনীতি জাতিসংঘের বিশ্বায়ন নীতিকে আরো জোরদার করে তুলবে এবং এব্যবস্থাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। তিনি আরো লিখেছেন যে, এ প্রক্রিয়া বেসরকারিখাত বিশ্বায়ন ব্যবস্থাপনার সাথে সংযুক্ত হবে এবং তা পুঁজিপতি ব্যবসায়ী সমাজকে সরাসরি বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাবে। উল্লেখ্য যে, পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্যবসায়ীরা (*Chaebols*) সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগে কোন প্রকার সহযোগিতা করতো না এবং তারা যে কোন রকম বিদেশী বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকতো। কারণ বিদেশীদের তৎপরতা কোরিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৯৪ সাল থেকে এসব ব্যবসায়ী সরকারের সাথে একীভূত ঘোষণা করে এবং তারা নিজেরাই সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে। তবে ১৯৯৬ সালে কিম ইয়াং সাম প্রশাসন সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন যার ফলে FDI ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। আন মি কিমের মতে, æIn 1996, by an official drive, the Kim Young Sam administration abolished the negative list of sectors and regions for FDI. It also relaxed regulation on `foreign real-estate' acquisitions; and raised the upper limit on OFDI private enterprise."[10] এভাবে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিথিলতার সাথে সাথে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়ার FDI সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে সমগ্র বিশ্বে দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্যাংক অব কোরিয়া এবং কোরিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসন্ধান করার মাধ্যমে এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলো দক্ষিণ কোরিয়া মডেলে OFDI পদ্ধতি চালু করে।[11]

ঐতিহাসিকভাবে এবং অবস্থানগত দিক থেকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভৌগলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এসব দেশের অধিকাংশই এক সময় ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা শাসিত হয়েছে। এছাড়া সাংস্কৃতিক ঐক্য, দ্রুত বাজার সৃষ্টি এবং সস্তায় জনশক্তি সরবরাহ ও সংগ্রহ প্রভৃতি কারণে এশিয়ার দেশগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীরা সরাসরি বিনিয়োগে উৎসাহ লাভ করেছে। এ প্রক্রিয়ায় দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিনিয়োগের আগ্রহ থেকেই Korean Institute of International Economic Policy (KIEP) গঠিত হয়। KIEP গঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে KIEP প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, “the single most important motive for OFDI in 1994 was to seek new overseas markets followed by the motive

utilizes lower wages host nations.[12] অপর এক গবেষণায় দেখা যায়, স্বল্প বেতনে শ্রমিক সংগ্রহ এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সাধন-এই দুটি কারণ দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের পটভূমি তৈরি করে। এসব কিছু বিশ্লেষণ করে কোরিয়ার রাজনৈতিক অর্থনীতি বা Political Economy বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ড. আন মি কিম দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিনিয়োগের কারণ হিসেবে লিখেছেন, "*Chaebols* aggressive overseas market expansion strategy (e.g. Eastern Europe) and their low wages strategy in response to rising wages in South Korea (e.g.Southeast Asia, China) as the prime reasons for Korea conglomerates concentration in Asia." [13]

এ প্রক্রিয়ায় ১৯৯২ সালে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে একমাত্র বিদেশী বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে আর্বিভূত হয়। এ সময় এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোরিয়ার সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে শ্রমিক আমদানি খাতকে সরকারিভাবে অনুমোদন করা হয়। তবে বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান, দ্রুত বাজার দখল, এবং সস্তায় শ্রমশক্তির আমদানি প্রভৃতি দক্ষিণ কোরিয়ার পুঁজিপতি ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। একই কারণে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্যদেশ, যেমন- ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা প্রভৃতিদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের পরিমান ও খাত বৃদ্ধি পায়। এসব বিনিয়োগ এসব দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং শিল্পনির্ভর অর্থনীতি গঠনে সহায়তা করে। এভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ সম্প্রসারণের ফলে এ সমস্ত দেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় বাণিজ্যিক সেতুবন্ধনের সৃষ্টি হয়, যদিও দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে 'অভিজ্ঞতাবাদতত্ত্ব'কে সেতুবন্ধন রচনার ভিত্তি হিসেবে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন।

এভাবে একটি উন্নয়নশীলদেশ হিসেবে শ্রমিক খাতকে শক্তিশালী করা এবং আধুনিক বিশ্বায়ন নমুনায় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ কোরীয় ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিকভাবে কারখানা নির্মাণ পদ্ধতি অনুসরন করে। এছাড়া খাতভিত্তিক কোরীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী কোরীয় FDI নীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শিল্পখাতে বাংলাদেশের মোট বিদেশী বিনিয়োগের দুই-তৃতীয়াংশ আসে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে যার অধিকাংশই বস্ত্র উৎপাদন ও বস্ত্রশিল্প, চামড়া ও জুতাশিল্প এবং কৃষিভিত্তিক ও খাদ্য

উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। মোটের ওপর কোরীয় প্রযুক্তি এবং বিনিয়োগ ছাড়া বাংলাদেশ উপরোক্ত প্রকার পণ্য তৈরি করতে সক্ষম ছিল না এবং এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিদেশী সহায়তার মাধ্যমেই বাংলাদেশ তা করতে সক্ষম হয়েছে।

বিগত ১০ বছর যাবত কোরিয়ার সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নীতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ সময় নতুন বাজার সৃষ্টির চেয়ে কম দামী ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ওপর দক্ষিণ কোরিয়া গুরুত্বারোপ করেছে। এজন্য সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে স্বল্পোন্নত দেশ, যেমন-বাংলাদেশসহ সার্কভূক্ত এমনসব দেশকে নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে কোরীয় পণ্যদ্রব্য সহজেই বাজার দখল করতে সক্ষম হবে।[14] দক্ষিণ কোরিয়া ও পূর্ব-এশিয়ার দেশগুলো এখনো (Empirical studies) ‘অভিজ্ঞতাবাদতত্ত্ব’ অনুসরণ করে চলে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশে কোরীয় বিনিয়োগকারীরা সপ্তম বৃহত্তম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন জোন বা Export Processing Zone (EPZ) স্থাপন করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে কোরীয় সরকার বাংলাদেশের বিনিয়োগ বোর্ড বা Board of Investment-এর সাথে নিবন্ধন করে এবং ২৬৯টি ক্ষেত্রে সরকারি ও যুগ্ম বিনিয়োগ প্রস্তাবের মাধ্যমে ৬১৪.৪২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। কোরীয় বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে যে সব পণ্য সামগ্রীকে চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে রয়েছে কৃষি পণ্য উৎপাদন ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন শিল্প, ছাপাখানা ও প্যাকেটজাতকরন শিল্প, চামড়া ও রাবার শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাঁচ ও সিরামিক শিল্প, প্রকৌশল ও সেবামূলক শিল্প এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা বেকার সমস্যার সমাধান প্রভৃতি। এছাড়া কোরীয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কোরিয়া সরকার বাংলাদেশে কোরীয় খামার স্থাপন করে যার ফলে ৬৯২১৪ জন বাংলাদেশীর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হয়। অধিকন্তু বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী কোরীয় সরকারের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সংক্রান্ত অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নীচে একটি ছকের সাহায্যে Board of Investment বা (BOI) এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃক বাংলাদেশে বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

Source of Investment বা বিনিয়োগের সূত্র

বিনিয়োগরে ধরণ (BOI এর সাথে নিবন্ধনকৃত)	প্রকল্প নং	পরিমান		কর্মসংস্থান
		(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	(মিলিয়ন টাকা)	
সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ	১১৪	১০,০০১,৩২৯	২০৯.৪৪২	৪৬,৬৬৫জন
যৌথ বিনিয়োগ	১৫৫	২০,০২০.৪০৫	৪০৪.৯৮০	২২,৫৪৯জন

মোট	২৬৯	৩০০২১.৭৩৪	৬১৪.৪২২	৬৯,২১৪জন

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা

BOI এর সাথে নিবন্ধনকৃত সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্প

সেক্টর	ইউনিট নং	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)		কর্মসংস্থান
কৃষি ভিত্তিক প্রকল্প	১৮	১১৬৯.৪৪০	২২.৩৩০	১০২৮জন
খাদ্য ও খাদ্যউৎপাদন ভিত্তিক শিল্প	৪	১৭৭.০৩৫	৪.৭০১	১২৬ জন
টেক্সটাইল শিল্প	১০১	১১২৫৯.৪৩৪	২২১.২০২	৫১০০২ জন
ছাপাখানা ও ছাপাপ্রক্রিয়াজতকরন	৭	২০৫.৮১২	৪.১৮০	৩৭৩ জন
চামড়া ও রাবার শিল্প	১৯	১০৮৪.৬১৪	২৬.০০০	৫০০৩ জন
রাসায়নিক শিল্প	৩৬	২৩৩৮.৩৫৪	৫১.৯০১	১৯৩২ জন
গ্লাস ও সিরামিকস্	৫	৩৬.২৬০	০.৭৬৩	১৮৮ জন
প্রকৌশল	৩২	১৩৭৬.৪৮৮	২৯.৬০০	১৮৪৭ জন
সেবা শিল্প	৩৯	১২১৮৫.৪২৯	২৫০.০৮১	৬৯৭৭ জন
অবকাঠামো শিল্প	৮	১৮৮.৪৭২	৩.৬৬৪	৭৩৮ জন
মোট	২৬৯	৩০,০২১.৭৩৮	৬১৪.৪২২	৬৯,২১৪ জন

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা

কেবলমাত্র কোরিয়া সরকারের বিনিয়োগের ফলে এসব বিনিয়োগের মধ্যে কৃষি, বস্ত্র, রসায়ন, প্রকৌশল এবং সেবাভিত্তিক প্রকল্প শতকরা ৯০ ভাগ সফলতা অর্জন করেছে। নীচের সারণীর মাধ্যমে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র উপস্থাপন করা হলো ঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র	ইউনিট নং	বিনিয়োগ (মিলিয়ন টাকা)	বিনিয়োগ (মিলিয়ন ডলার)
বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প উৎপাদন প্রকল্প	৬৬	৪২৮২.৭৮০	৯৭.১৭৩
বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্প	১১	৮০৪.৬৯২	১৪.৩০৭
অবাস্তবায়নাধীন প্রকল্প			
নতুন নিবন্ধনকৃত প্রকল্প	৬০	৭৪৩৯.৫৫২	১১৭.৪২৭
বন্ধ প্রকল্প	৪	২১৭.৫৬৪	৪.৫৪১
পদক্ষেপ না নেওয়া প্রকল্প	২৯	৬,৫৮১.৬৪৯	১৪৬.৫৬৩
নিয়ন্ত্রণহীন প্রকল্প	৯৯	১০,৩৯৫.৫৫০	২৩৪.৪১১
মোট	২৬৯	৩০,০২১.৭৩৮	৬১৪.৪২২

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা

উপরোক্ত প্রকল্পগুলো এককভাবে কোরীয় বিনিয়োগকারীদের মালিকানাধীন। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীগণ অন্যান্য আর্ন্তজাতিক শক্তি ও দেশের বিনিয়োগকারীদের সাথে যৌথভাবেও বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে একটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'Ecorntech Inc' নামক কোম্পানি। এই যৌথ কোম্পানি বাংলাদেশে বিভিন্নখাতে অর্থ বিনিয়োগ করে। ইতোমধ্যে এ কোম্পানি বাংলাদেশে হাউজিং বা আবাসন প্রকল্পে ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অকাঠের তৈরি বোর্ড নির্মাণের জন্য ৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে। এই শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কৃষিজাত দ্রব্যের পরিত্যক্ত অংশ, যেমন ধানের চিটা, গমের উছিছষ্ট, পাটের উছিছষ্ট প্রভৃতি পণ্য ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া হুন্দাই (Hyundai) শিল্পগোষ্ঠী এবং আরো কয়েকটি কোম্পানি বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে। এই 'Ecorntech Inc' কোম্পানি BOI কে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছে এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করার জন্য মন্ত্রীপর্যায়ে উভয় দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ সব অগ্রগতি থেকে ধারণা করা হয় যে, সাম্যবাদী চীনের ছোট ও মাঝারি ধরণের যানবাহন প্রকল্পে দক্ষিণ কোরিয়া যে বিনিয়োগ করেছিল বর্তমানে তা পরিবর্তিত হয়ে অন্যান্য ছোট দেশের মত বাংলাদেশেও কোরীয় বিনিয়োগের আগমন ঘটেছে।

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার সরাসরি বিনিয়োগের কারণ

বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থান, সস্তা শ্রমশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য বিদেশী বিনিয়োগকারীদের এদেশে বিনিয়োগ করতে প্রায়ই আকৃষ্ট করে। এপ্রক্রিয়ায় এসব কিছুর সমন্বয় কোরীয় বিনিয়োগকারীদেরকেও এক্ষেত্রে আগ্রহী করে তোলে। বাংলাদেশ প্রায় ১৪০ মিলিয়নের উর্দ্ধের জনসংখ্যা অধ্যুষিত এমন একটি রাষ্ট্র যা কোরীয় বিনিয়োগকারীদের অনুকূল বাজার তৈরি করতে সহায়ক হয়। অধিকন্তু, বাংলাদেশের জনগনের ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কোরীয় পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান বাংলাদেশের পরিবেশের সাথে যথেষ্ট মানানসই ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া বাংলাদেশের ঘন জনবসতি বিদেশীদের কাছে লোভনীয়ও বটে। কারণ অতি সস্তায় এদেশে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় এবং এসব শ্রমিক ব্যবহারের মাধ্যমে অতি অল্প খরচে বিশ্বমানের পণ্য প্রস্তুত করা সম্ভব। তাছাড়া এসব শ্রমিক ইতোমধ্যে বিদেশী শিল্পকারখানায় কাজ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সততা,নিষ্ঠা, দক্ষতা এবং যোগ্যতার সপ্রশংস প্রমাণ ও নজীর স্থাপন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও বৈপ্লবিক ধাঁচের সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। সুতরাং কোরীয় সরকার অনুধাবন করে যে বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি কোরীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডও বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বাংলাদেশের মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কোরীয় পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কোরীয়রা বাংলাদেশকে সহায়তা করে চলেছে।

তৃতীয়তঃ কোরীয় ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে কোরীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশ সফর করেন। এসময় তারা বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, বিনিয়োগকারী ও অর্থমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উপলব্ধি করেন যে, বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন, কোমল পানীয়, আইসক্রীম, বিশুদ্ধপানি সরবরাহ এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষের আবাসিক গৃহ নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব। কোরীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমেও বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।[15]

চতুর্থতঃ বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি বাংলাদেশে কোরীয় বিনিয়োগকারীদেরকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের শ্রমিক অতি সহজেই বিশ্বমানের পণ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। তাছাড়া বাংলাদেশে স্থাপিত কোরীয় EPZ-এ বাংলাদেশী শ্রমিকদেরকে 'Optimum Profit Earning Bases in the World' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনও বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহদানের জন্য এক্ষেত্রে বিরাজমান বিধিনিষেধের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করছে। বাংলাদেশের EPZ সংক্রান্ত গবেষক জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, "The role of government is now promotional rather than regulatory."[16]

পঞ্চমতঃ দক্ষিণ কোরিয়ার বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অংশ হিসেবে কোরীয় সরকার ও পুঁজিপতিরা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঘুর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, নদী খনন, কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন, দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল লাইন স্থাপন, সার কারখানা স্থাপন, ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের পাশে শিল্পপার্ক স্থাপন, পদ্মাসেতু নির্মাণ, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, রেলপথের সংস্কার, ঢাকা-চট্রগ্রাম Elevated Express রেলযোগাযোগ স্থাপন প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে কোরীয় বিনিয়োগকারীরা সানন্দে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ

করেছেন।

ষষ্ঠতঃ অর্থনৈতিক এবং ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সাথে সাথে এশিয়ার দেশগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগ এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এসব পরিবর্তন বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের বিনিয়োগের দ্বার উন্মোচন করেছে। আবার পণ্যের উৎপাদনও বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশে অন্যান্যদেশের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হেলাল উদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, "Rising wage rate and production cost in many Asian countries, such as the Philippines and Vietnam are making low-cost manufacturing".[17] এমনকি মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ডেও উচ্চ মজুরির শ্রমের বাজারের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এ ধরণের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ দ্রুত প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন, উত্তোলন ও ব্যবহারের ওপর বিনিয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ফলে জাপান, থাইল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড এবং ভারতসহ আরো অনেক দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেছেন এবং EPZ-এর মাধ্যমে তাদের বিনিয়োগের পরিমানও বৃদ্ধি করেছেন।[18]

নীচে এশিয়ার অন্যান্যদেশের তুলনায় বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

বিদেশে কোরিয়ার সরাসরি বিনিয়োগ চিত্রঃ

(ইউনিট সংখ্যা ঃ হাজার মার্কিন ডলার)

দেশের নাম	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধনকৃত কোম্পানির প্রকল্প সংখ্যা	বিনিয়োগের পরিমান (US$)
চীন	৩৩,২৭৫	১৯,৫১২	৩১,০১৩,২১১
ভিয়েতনাম	২,৭৭৮	১,৪১৫	৬,০৫৯,৯০৭
ভারত	৬৮৮	৩৪৫	১,৮২৬,৭২০
শ্রীলংকা	৩০৭	১৫৬	৭০৯,৯৪৯
বাংলাদেশ	৩১৩	১৮৫	৪০৮,৫০৪
নেপাল	১৯	১৯	১৩,৫৮৯

উৎস: ইন্টারনেট

ওপরের সারণী থেকে দেখা যায় যে, এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অধিক জনসংখ্যা

এবং স্বল্পমূল্যে শ্রমিক ও কাঁচামাল সংগ্রহ প্রভৃতি কারণে ঐসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরীয় বিনিয়োগের পরিমান তুলনামূলকভাবে বেশি। এর পরিবর্তিত চিত্র অপর একটি সারণীর মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলোঃ

	নিবন্ধনকৃত FDI সংখ্যা	কোম্পানির সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ(USS)	প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থ (US$)	বিনিয়োগকৃত মূলধন (US$)
মোট	২৯৮	১৭৫	৩৯২,০৩৭	৪১৫	১৯০,৮৮৯
১৯৮০	১	১	৯২	১	৯২
১৯৮২	১	১	৫৪	১	৫০
১৯৮৩	১	১	৮০	১	৬৬
১৯৮৪	০	০	০	০	০
১৯৮৭	১	১	৫০০	০	০
১৯৮৮	০	০	০	৬	৫০০
১৯৮৯	৫	৪	৩,৬৪৪	০	০
১৯৯০	১১	৫	৩,৫০৬	৯	২,৩০৬
১৯৯১	৭	৫	৭,৮৭৫	৯	৩,৩৮৫
১৯৯২	৯	৮	৫,০১২	১২	৫,৩৪১
১৯৯৩	১৪	৭	১০,২০৪	৮	২,২৫৫
১৯৯৪	৩৭	২৮	২৩,৬৪৬	৫৪	৩৭,৮৮৭
১৯৯৫	২৩	১৪	৫৭,৩৬১	৪২	১৮,৩৮৫
১৯৯৬	৫১	৩৭	৭৭,৯৩৭	৬১	১৪,২২০
১৯৯৭	২৯	১৭	৩৪,৭৯৩	৪৮	১৩,৯০৭
১৯৯৮	২৪	৭	৮২,২৭৬	২৭	৩২,৭৩৪
১৯৯৯	১৫	৩	৩১,২২৮	২৩	৪৪,০৮৪
২০০০	৭	৫	৩১,৩৫	১৪	৯৯৮
২০০১	২৩	৮	৩০,৮৫৯	২০	২,৪৭৮
২০০২	৩	১	১,০৪৩	১৫	১,৩৬৪
২০০৩	১২	৩	৬,৭০৪	১৭	২,৭৬২
২০০৪	৫	২	৩,৪৮৮	১৭	৪,৬৪১

২০০৫	৫	৪	৫,৪১৬	৮	২,৩৬৬
২০০৬	১৪	১৩	৩,১৮৪	২২	১,০৬৮

উৎস: ইন্টারনেট

তথ্য নির্দেশঃ

১. World Bank(1998), *Assessing Aid : What Works, What Doesn't, and Why?* (London: Oxford University Press) p6. ODA-এর অধিক সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার জন্য দ্যষ্টব্য, DAC,OECD(1999)," IsThis Aid?" /OECD.

২. একটি সাহায্যদাতা দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উত্থান সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, Sang Tae Kim(2003), *ODA Policy of the Republic of Korea : In Context of its Evolving Diplomatic and Economic Policies* (Seoul: KOICA), pp,l-30; দ্রষ্টব্য, Ministry of Foreign Affairs and Trade , ROK(2000), *Koreas ODA* (Seoul: MOFAT), pp,8-114, দ্রষ্টব্য; Jungpil CHOI(2006), "Worldwide ODA Activities: Korea's Future ODA Policy" M.A Thesis, GSIS, Korea University,pp73-179; দ্রষ্টব্য, Kim Yang Mi(2000),"Korea's Official Development Assistance: New Strategies for Development Cooperation " M.A. Thesis, Ewha Womans University,pp,6-l15. দ্রষ্টব্য, Yoon-Sun Shim(2000), "Korea's Official Development Assistance: Trends and Strategies with an Emphasis on Assistance to Vietnam," Masters in International Cooperation Thesis, GSIS, YonseiUniversity,pp,l6-125 এবং আরো দ্রষ্টব্য, Sang Eun Eee(2003), "The Role of Korea's ODA: Bridging the Digital Divide in Developing Countries", Master of International Studies, GSIS, Ewha Womans University Seoul,ROK, pp,l5-120.

৩. Abdul Qadir, "Bangladesh and EDCF" Korea Eximbank(2003) in

Politics and Procedures in Received ODA Loans,(The 10th EDCF Work shop),p8.

৪. প্রাগুক্ত, p. 9.

৫. Planning Commission of the Government of Bangladesh (2005), *Annual Development* Programme, 2005-2006 (Dhaka Planning Commission, Programming Division) pp93-99; এছাড়া দ্রষ্টব্য, Ministry of Finance (Finance Division), *Bangladesh Economic Review*,2006, pp 89-110.

৬. দ্রষ্টব্য, Bangladesh Ministry of Finance, *Bangladesh Economic Review,* 2006 p 30.

৭. S.J. Kim(1988), "Effects of Outward Foreign Direct Investment on Home Country: Performance Evidence from Korea", KDI Working Paper. No 9804.

৮. Eun Mee Kim(2000), "Globalization of the South Korean *Chaebol*" in Samuel S. Kim(ed), Korea's Globalization (Cambridge, U.K. Cambridge University Press,2000) pp. 105-106.

৯. প্রাগুক্ত,

১০. প্রাগুক্ত, pp. 108-109.

১১. প্রাগুক্ত, pp. 110-111.

১২. Korean Institute of International Economic Policy (KIEP), "Policy Debate on Problems and Management of OFDI" March, 24,1998 (Quoted in Eun Mee Kim, প্রাগুক্ত,).

১৩. Eun Mee Kim, "Globalization of the Korean *Chaebols*", p.111.

১৪. Ross V. Avincula (2000), "Foreign Direct Investments,

Competitiveness, and Industrial Upgrading: The Case of the Republic of Korea", (Masters of International Economics Thesis, Korea Development Institute, Seoul),2000.

১৫. "Bangladesh has 180 million People, Offers Good Business Opportunities", Interview of Chairman Kim Hyung-Chul of P&S International (ROK) with *The Korea Post*, March 2007, p 31.

১৬. Helal Uddin Ahmed, "EPZs of Bangladesh "p L7.

১৭. প্রাগুক্ত,

১৮. প্রাগুক্ত,

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে কোরীয় ই.পি.জেড. স্থাপন ১৯৯৫- ২০০৭

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে কোরিয়ার রপ্তানিকরন এলাকা বা Export processing Zone (EPZ) স্থাপন করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং কোরিয়ার ইয়াংগানে কর্পোরেশনকে বাংলাদেশে ই.পি.জেড স্থাপন করার জন্য ভূমি বরাদ্দ দান করা হয়। পরবর্তীকালে আরো অনেক কর্পোরেশনকে ই.পি.জেড স্থাপন করার অনুমতি দেয়া হয়। এসব রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা থেকে কোরীয় শিল্প মালিকেরা কম খরচে উৎপাদন ও তা সরাসরি রপ্তানি করে থাকেন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার আরো অধিক সংখ্যক ই.পি.জেড স্থাপন করার জন্য কোরিয়াসহ অন্যান্য দেশের শিল্পমালিকদের বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদারনৈতিক নীতিমালা প্রনয়ন করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে কোরীয় ই.পি.জেড-এর শাখা ৭৪টি এর মধ্যে ৬০টি শাখা শিল্পপণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের একজন উধ্বর্তন কর্মকর্তা জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ Export Processing Zone (EPZ) বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা নিয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি ই.পি.জেড এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, EPZ হচ্ছে "a kind of Free Trade Zone while combines manufacturing and trade activities".[১] অর্থাৎ বিভিন্ন শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্য ও অন্যান্য সামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে ও বর্হিবিশ্বে আমদানি-রপ্তানি করা ও স্বল্প খরচে পণ্য উৎপাদন করে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ ও বর্হিবিশ্বে বাজারজাতকরনই ই.পি.জেড এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ লিখেছেন, It offers the enterpreneurs both home and abroad suitable package of investment opportunities, motivates them to use the zone as a low cost production base for labor intensive component manufacturing assembling and middle stage processing for exporting to home or external markets.[২]

আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরনের ধরণ ও প্রকৃতির আলোকে EPZ-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলোঃ

1. Manufacturing বা পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন
2. Warehousing and বা গুদামজাতকরন এবং

3. Combination of both বা উভয় কর্মকান্ডের সমন্বয়করন

বাংলাদেশের EPZ প্রথম শ্রেণীভূক্ত।[৩] বাংলাদেশে ই.পি.জেড স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করার পূর্বে বিশ্বে প্রথম ই.পি.জেড স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করা দরকার। 'ই.পি.জেড' একটি ইংরেজী শব্দ। এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো, 'Export Processing Zone' বা 'রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা'। এ ধরণের সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বিশ্বে প্রায় ৫০ বছর পূর্বে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা ও পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে অসংখ্য ই.পি.জেড সক্রিয় রয়েছে এবং বিপুল জনশক্তি ই.পি.জেড সংশ্লিষ্ট পেশায় কর্মরত রয়েছেন। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারতে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে প্রথম ই.পি.জেড স্থাপিত হয় এবং এসময় EPZ কেবলমাত্র Special Economic Zone বা বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু বর্তমানে EPZ এর বিস্তৃতি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা হিসেবে এর সীমানা অতিক্রম করেছে এবং তা দেশের পররাষ্ট্রনীতিকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এমনকি অত্যাধিক গুরুত্বের কারণে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও EPZ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং দেশের সচেতন নাগরিকগণও এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা করে থাকেন। মনে রাখা দরকার যে, ৫০ বছর পূর্বে EPZ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান বিশ্বে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকেই প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্ব লাভ করে থাকে। এভাবে সময়ের ব্যবধানে ১৯৮০ সালের দিকে EPZ বা বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা সমগ্র বিশ্বে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] বিশ্বে EPZ স্থাপনের সাথে সাথে এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে জনসচেতনা বৃদ্ধি পায় এবং তখন থেকে মানুষ এ সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করার প্রয়াস লাভ করে। আলোচ্য অধ্যায়ে EPZ-এর প্রকৃতি ও ধরণ এবং বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার EPZ স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করা হবে। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একথা বলা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন দেশে যে সব EPZ স্থাপন করা হয়েছে তা সে সব দেশ অর্থাৎ স্বাগতিক দেশের একান্ত প্রয়োজনে ও অনুরোধের প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিটি রাষ্ট্রই এর অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য EPZ স্থাপন করেছে এবং এর পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পটভূমিকার ভূমিকা পালন করেছে। অধিকন্তু, EPZ একটি দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার পথ প্রদর্শক এবং তা একটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সূতিকাগার হিসেবেও কাজ করে।

দ্বিতীয়তঃ EPZ স্থাপনের ফলে EPZ স্থাপনকারী দেশ এবং EPZ স্থাপনের জন্য অনুমতি প্রদানকারী দেশের মধ্যে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া জোরদার হয় এবং এসব দেশের মধ্যে কূটনতিক সম্পর্কও যথেষ্ট জোরদার হয়ে ওঠে। ফলে সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হয় এবং অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলো আরো স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দূর্বল রাষ্ট্র EPZ স্থাপনের মাধ্যমে অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৫] বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার EPZ স্থাপনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উভয় দেশের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে দক্ষিণ কোরিয়া উন্নত রাষ্ট্র এবং ১৯৭০ সালে সেখানে প্রথম EPZ স্থাপিত হয়,যদিও বাংলাদেশে EPZ স্থাপিত হয় আরো অনেক পরে।

EPZ স্থাপনের ইতিহাস

EPZ স্থাপনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায় EPZ শব্দটির প্রথম সূচনা হয় “মুক্ত” বাণিজ্যিক জোন বা এলাকা স্থাপনের মাধ্যমে। এই বাণিজ্যিক এলাকা প্রথম স্থাপিত হয় আঠারো ও উনিশ শতকে জিব্রাল্টার, হংকং এবং সিংগাপুর এলাকার বাণিজ্যিক কার্যাবলী পরিচালনার মাধ্যমে। প্রথমদিকে মুক্ত বাণিজ্য কিছু খসড়া নিয়ম-নীতির দ্বারা পরিচালিত হতো। এ সময় EPZ এর মাধ্যমে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে পণ্য আমদানি-রপ্তানি, জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করা প্রভৃতি কাজ সম্পাদিত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বাণিজ্যিক খাত দ্রুত উন্নতি এবং সম্প্রসারণের সাথে সাথে EPZ-এর পরিধিও বিস্তার লাভ করে। এ সময় পণ্য আমদানি-রপ্তানির পাশাপাশি বাণিজ্যিক নীতির সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[৬] EPZ-এর মাধ্যমে ‘মুক্ত বাণিজ্যিক এলাকা’ কে দুটি অর্থে ব্যবহার করা হয়। প্রথমতঃ ই.পি.জেড এর মাধ্যমে শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী আমদানি-রপ্তানি করা হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ ইপিজেড প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিতে অর্থাৎ অভ্যন্তরীনভাবে পণ্য আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৭] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর সদ্য স্বাধীন দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে বিভিন্ন শিল্পপণ্য নিজেরা উৎপাদন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকের দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানি এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পণ্য রপ্তানির নতুন নীতি প্রনয়ণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ সময় এসব উন্নয়নশীল রাষ্ট্র তাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বেপরোয়াভাবে শিল্প পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে শুরু করে এবং উৎপাদিত পণ্য নিজেদের চাহিদা

পূরণের পর রপ্তানি করার প্রতি মনোনিবেশ করে। এ ধারণাই EPZ স্থাপনের সূতিকাগার হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ, উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজার তৈরি, প্রাকৃতিক ও সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ প্রভৃতি EPZ স্থাপনের উপাদান হিসেবে কাজ করে।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্নদেশে উৎপাদিত সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানির জন্য আমদানিকারক ও রপ্তানিকারক দেশ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান ও আইন-কানুনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিষ্ঠানকে মধ্যস্বত্ত্বাধিকারীর ভূমিকা পালন করার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ফলে অবধারিতভাবে এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে EPZ বা Export Processing Zone নামক প্রতিষ্ঠানটি আত্মপ্রকাশ করে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তা বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে। এভাবে EPZ-এর মাধ্যমে গার্হস্থ্য অর্থনীতির স্থলে সার্বজনীন অর্থনীতির সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ দেশীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের সূতিকাগার হিসেবে EPZ কাজ করে।[৮]

প্রকৃতপক্ষে EPZ একটি দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সীমানা পেরিয়ে সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এমনকি বর্তমানে কোন একটি প্রতিষ্ঠান, কারখানা কিংবা সংস্থা EPZ-এর মাধ্যমে এককভাবে তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী আমদানি রপ্তানি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ভারত ও বাংলাদেশের পোশাক তৈরি প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও এ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক EPZ-এর প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন মনস্তাত্বিক পণ্য সামগ্রী এবং পর্যটনশিল্পের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিজ নিজ দায়িত্বে সরবরাহ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ILO বা International Labor Organization এর সমীক্ষায় দেখা যায় যে, EPZ-এর কর্মপরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং বর্তমানে ১৩০টি দেশে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩৫০০ এর বেশি EPZ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৯] এসব EPZ-এ প্রায় ৬৬ মিলিয়ন শ্রমিক কাজে নিয়োজিত রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৪০ মিলিয়ন চীনা শ্রমিক। নীচে একটি সারণীর মাধ্যমে বিভিন্ন বছরে বিশ্বে EPZ এর বিস্তৃতির চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

Table no-1. Expansion of EPZs in the world

বছর	১৯৭৫	১৯৮৬	১৯৯৭	২০০২	২০০৬
বিভিন্ন দেশের ইপিজেড সংখ্যা	২৫	৪৭	৯৩	১১৬	১৩০
ইপিজেড জোন সংখ্যা	৭৯	১৭৬	৮৪৫	৩০০০	৩৫০০

শ্রমিক সংখ্যা (মিলিয়ন)	-	-	২২.৫	৪৩	৬৬
চীনের শ্রমিক সংখ্যা	-	-	১৮	৩০	৪০
বিভিন্ন দেশের শ্রমিকের গড় সংখ্যা	০.৮	১.৯	৪.৫	১৩	২৬

Note: Including bonded warehouse in Bangladesh

উৎস: Boyenge (2007)

বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও কারখানা EPZ-এর সাথে তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করলেও শুল্ক আরোপ ও এ ধরণের বিষয় নিয়ে ঐসব ফ্যাক্টরি মালিক ও EPZ কর্তৃপক্ষের মধ্যে নানা রকম জটিলতার সূত্রপাত হয়। এক্ষেত্রে যেসব জটিলতা বেশি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে আলোচ্য অধ্যায়ে পরবর্তীতে তা উপস্থাপন করা হবে। বর্তমানে বিশ্বে মোট কয়টি বা কতগুলো কারখানা এককভাবে EPZ এর মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, ১২টি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠির আবাসিক শহর, বিশেষ করে চীনের অর্থনৈতিক এলাকা ও নতুনভাবে গড়ে ওঠা শিল্পশহর এবং ১২টি দেশের প্রায় ১০,০০০ এর ও অধিক শহর এসব EPZ-এর মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।[১০]

বর্তমান বিশ্বের প্রায় অর্ধেক রাষ্ট্র EPZ-স্থাপনের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেছে এবং সমগ্র বিশ্বে তা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। EPZ-র নীতি নির্ধারণী কর্মতৎপরতার মাধ্যমে ১৯৫৯ সালে আয়ারল্যান্ডের সানন (Shannon) বিমান বন্দরে প্রথম EPZ স্থাপিত হয়।[১১] সাননে EPZ স্থাপনের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এখান থেকে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা শিল্পায়ন ভিত্তিক উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করে।[১২] পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশ সানন EPZ স্থাপনের ধারাকে অনুসরন করে যা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম ১৯৬২ সালে পুয়ের্তোরিকো এবং ১৯৬৫ সালে ভারতে EPZ স্থাপিত হয়। এরপর ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র, মেক্সিকো এবং ব্রাজিল EPZ স্থাপন করে। তবে ১৯৭০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত EPZ সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এসময় এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে কলম্বিয়া, এলসালভেদর, গুয়েতেমালা, হন্ডুরাস, জ্যামাইকা প্রভৃতি দেশ; আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে মৌরিতানিয়া, লাইবেরিয়া, সেনেগাল; মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে জর্ডান EPZ স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালে চীন প্রথমবারের মত বিশ্বের চতুর্থ

বৃহত্তম বিশেষ অর্থনৈতিক জোন বা অঞ্চল স্থাপন করে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০-এর দশকে কতিপয় নতুন রাষ্ট্র যেমন-বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কোষ্টারিকা, বুলগেরিয়া এবং সাইপ্রাসে প্রথমবারের মত EPZ স্থাপন করা হয়। ১৯৯০ সালের দিকে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যখন EPZ স্থাপিত হয় তখন আফ্রিকার কয়েকটি দেশ, যেমন-কেনিয়া, নামিবিয়া, ক্যামেরুন এবং জিম্বাবুইয়ে EPZ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এভাবে EPZ সমগ্র বিশ্বে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যা সমগ্র বিশ্বে Export Processing Firm গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সুচারুভাবে পরিচালনা করে।

তবে কতিপয় অর্থনীতিবিদ এবং EPZ বিশেষজ্ঞ এ ব্যবস্থার বিভিন্ন দুর্বলতা ও অনিয়ম চিহ্নিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, জয়ন্তকুমারান (Jayanthakumaran) নামক একজন EPZ বিষয়ক গবেষক EPZ স্থাপনের বিপক্ষে মতবাদ প্রদান করেন। তিনি চীন এবং শ্রীলংকায় EPZ স্থাপন এবং সেখানে EPZ স্থাপনকারী দেশের আধিপত্যবাদী প্রভাব পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেন।[১৩] তার মতে EPZ স্থাপনের ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান হয়, যদিও দীর্ঘমেয়াদীভাবে তা দেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। তিনি আরো বলেন যে, EPZ স্থাপনের ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক সেখানে কর্মরত থাকার ফলে সেদেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা এবং শ্রমিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হয়। গবেষণার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, EPZ স্থাপনের ফলে একটি দেশের শিল্পায়ন খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। তবে এতে সেসব দেশের জাতীয় স্বার্থ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এর ফলে জাতীয় শিল্পায়ন নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং দেশীয় শিল্প-কারখানা বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। আবার EPZ-এর উপরোক্ত নেতিবাচক ধারণার বর্ণনা প্রসঙ্গে EPZ সংক্রান্ত অপর একজন গবেষক মাদানী দোরসাতি (Madani Dorsati) তাঁর *A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones*-গ্রন্থে লিখেছেন æ.........establishing an EPZ is not a first best policy choice superior to overall liberation of the economy”[১৪]

EPZ ও শ্রমিক নীতি

ওপরের বিভিন্ন দোষত্রুটি ও দুর্বল দিকের উপস্থিতি সত্ত্বেও EPZ-এর অসংখ্য ইতিবাচক দিক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমিক আইন ও লিঙ্গ সমতা (Gender Equality) বিষয় দু'টি বর্তমান বিশ্বের EPZ গুলোর শ্রমিক নীতির সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। কারণ EPZ-এ শ্রমিক

নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতা এই দুই নীতিকে প্রাধান্য দান করা হয়,যদিও EPZ-এ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য অবকাঠামো অপেক্ষা শ্রমিকদের দক্ষতাকে কমগুরুত্ব প্রদান করা হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, EPZ-এ নিয়োগকৃত শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় তা একইমানের EPZ বর্হিভূত কোম্পানিতে কর্মরত একজন শ্রমিককে তার থেকে অনেক বেশী মজুরি প্রদান করা হয়। এরপরও EPZ-এ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে EPZ স্থাপনের অনুমতি প্রদানকারী দেশের প্রচলিত নিয়মনীতির চেয়ে অনেক বেশী ছাড় দেওয়া হয়। কারণ EPZ-গুলো বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অধিকসংখ্যক EPZ স্থাপন করা হয়। এর কারণ এসব দেশে সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ করা সম্ভব। এছাড়া এসব দেশের সরকার প্রধানেরা সব সময় বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশকে শিল্পায়িত এবং অধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ক্ষেত্র অনুসন্ধান করে থাকেন। তবে শ্রম অনীহার ক্ষেত্রে বিধিবদ্ধ নিয়ম চালু করা হলে এবং তার বাস্তব প্রয়োগ হলে তা EPZ শ্রমিকদের জন্য কল্যাণকর এবং তা শ্রমিক মজুরকে আরো প্রতিযোগী করে তুলবে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর ও সুখী জীবন উপহার দেবে।[১৫] এর বাস্তব উদাহরণ লক্ষ্য করা যায় দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে। দক্ষিণ কোরিয়ার মাসানে (Masan) EPZ স্থাপনের সময় সেখানকার উন্নতির স্বার্থে কারিগরি যন্ত্রপাতি ও প্রকৌশলী প্রেরণ করে[১৬] এবং সেখানকার মানুষের আস্থা অর্জনের জন্য নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত স্থানীয় শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।[১৭]

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় EPZ-এ শ্রমিক নিয়োগ নীতি ও এর বাস্তবায়ন সম্বন্ধে যথেষ্ট সমালোচনা করা হয়েছে। এসব প্রচারপত্রের অভিন্ন অভিমত এই যে, EPZ-এ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ILO বা International Labor Organization এর নিয়ম উপেক্ষিত হয় এবং EPZ শ্রমিকদের কম বেতনে বেশী পরিশ্রম করানো হয়। আরো অভিযোগ করা হয় যে, EPZ-এ কর্ম পরিবেশও নিরাপদ নয় এবং শ্রমিক অধিকারেরও কোন প্রয়োগ নেই। এসব শ্রমিকের তেমন কোন বাড়তি সুবিধা প্রদান করা হয় না, বরং নির্ধারিত কর্মঘন্টার চেয়েও বেশী সময় কাজ করানো হয় মর্মে প্রায়ই অভিযোগ করা হয়। ১৯৮০-র দশকে লী (Lee) নামক জনৈক ILO গবেষক EPZ-এ শ্রমিক ইস্যু বিষয়ে একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, æ........... Ausertion of 'Super exploitation' regarding the nature of EPZ employment rest on two assumption, namely, a level of work intensity beyond the normal mental and physical capacity of workers, and level of wages that is below the physical subsistence level".[১৮]

লী-এর উপরোক্ত বর্ণনা থেকে EPZ-এ শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যায়। এখানে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার অনেকাংশে অনুপস্থিত এবং তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এছাড়া শ্রমিকদেরকে কেবলমাত্র শ্রমিক হিসেবেই ব্যবহার করা হয় এবং এখানে মানবতাবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত।[১৯] এভাবে EPZ শ্রমিকরা যখন EPZ ছাড়া অন্যান্য কোম্পানির কর্মচারীদের সাথে নিজেদের কর্মক্ষেত্রের তুলনা করে তখন তাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। অথচ সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদেরকে মূল্যায়ন করা হলে তারা অতি উৎসাহের সাথে তাদের ওপর আরদ্ধ দায়িত্ব সম্পাদন করতো। অধিকন্তু, বিভিন্ন দেশের মফস্বল শহরগুলোতে অবস্থিত EPZ-এর মহিলা শ্রমিকদের কর্ম পরিবেশও অনুকূল নয়। তাদের বেতন কাঠামো আরো শোচনীয় এবং অপ্রতুল। EPZ-এর পাশে অবস্থিত অন্যান্য শিল্পকারখানার শ্রমিকদের চাইতে সেখানে কর্মরতদের আরো কম পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়। এ প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিরূপে EPZ-গুলোতে শ্রমিক আন্দোলন ও সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

তবে উন্নয়নশীলদেশসমূহ EPZ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নীতি গ্রহণ করেছে। এর পেছনে অবশ্য কতিপয় কারণ রয়েছে। এর মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলো প্রধান। প্রথমতঃ এসব EPZ-এর বেতন কাঠামো একটি দেশের পারিপার্শ্বিকতা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০এবং ১৯৮০-র দশকের দিকে মালয়েশিয়া এবং শ্রীলংকার EPZ অপেক্ষা ফিলিপাইনের বাতান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মাসান EPZ-এ শ্রমিকদের অনেক কম মজুরি প্রদান করা হতো।[২০]এর কারণ ছিল যে, সে সময় এই দুই দেশের শ্রমিকদের বেতন কাঠামো অন্যান্য কারখানার বেতন কাঠামোর সমান ছিল এবং জনবলও পাওয়া যেত প্রচুর সংখ্যায়। দ্বিতীয়তঃ এ সময় এসব দেশে অতিরিক্ত কর্মঘন্টার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা হতো। ফলে তাদের বেতন এবং অতিরিক্ত পারিশ্রমিক অন্যান্য কারখানার কর্মচারিদের সাথে সমন্বয় হয়ে যেত। আবার দক্ষিণ কোরিয়ার মাসান EPZ-এ ১৯৮৭ সালের শ্রমিক সংঘর্ষের পর বেতন কাঠামো পরিবর্তন করা হয় এবং তাদেরকে অন্যান্য স্থানীয় কারখানার কর্মচারিদের সমমূল্যের পারিশ্রমিক প্রদান করা শুরু হয়। তবে বেতনজনিত এসব পরিবর্তন কেবলমাত্র স্থায়ী পুরুষ শ্রমিকদের জন্য চালু করা হয়,যদিও নারী, বিদেশী শ্রমিক, অস্থায়ী শ্রমিক ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগকৃত শ্রমিকদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। [২১]

বিশ্লেষকরা এক্ষেত্রে প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে EPZ-এ কর্মরত সকল শ্রমিকই কি সুবিধা বঞ্চিত এবং এক্ষেত্রে কিভাবে তারা তাদের বিভিন্ন অধিকার সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হবে? এর উত্তরে বলা যায় যে, EPZ-গুলোতে কর্মরত সকল শ্রমিকই সুবিধা বঞ্চিত নয় এবং

নিম্নশ্রেণীর ও মহিলা শ্রমিকরাই কেবল সুবিধা বঞ্চিত। এছাড়া কারখানাগুলোতে শ্রমিকদের স্বার্থ সংক্রান্ত যেসব বিশৃংখলা বিরাজমান ছিল তা প্রতিরোধে শ্রমিকরা আন্দোলন করতে পারে। এভাবে Trade Union Movement-এর সূত্রপাত হতে পারে যা শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে সহায়ক হবে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর সকল দেশের EPZ-এ এ ধরণের অবস্থার সৃষ্টি নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আয়ারল্যান্ডের EPZ শ্রমিকেরা দেশের অন্যান্য শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের মত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। একইভাবে সানন EPZ-এর শ্রমিকদেরকে দেশের অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের মতই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।[২২] সিঙ্গাপুরও এর উদাহরণ হতে পারে এবং সেখানকার শ্রমিকেরা অন্যান্য কোম্পানির শ্রমিকদের মত সুবিধা ভোগ করে।[২৩] এমতবস্থায় স্বাগতিক দেশের সরকার ও প্রশাসনের সব সময় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, মজুরি বা অন্যান্য কারণে শ্রম অসন্তোষের ফলে দেশের সরকার প্রধানদের উচিৎ EPZ-গুলোতে যেন শ্রমিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে না পারে। এজন্য দরকার শ্রমিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্যলোচনা করা এবং তাদেরকে দায়িত্ব পালনও অন্যান্য বিষয়ে কতিপয় বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতি বেঁধে দেওয়া। তাছাড়া শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে আলাপ-আলোচনা করে তাদের দাবি-দাওয়া অনুসন্ধান করা ও দর কষাকষির মাধ্যমে তাদেরকে সংঘাতময় পর্যায়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করা দরকার।[২৪] কোন কোন দেশের সরকার প্রধান বিভিন্ন ধরণের দমনমূলক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে EPZ-গুলোতে শ্রমিক আন্দোলনকে শান্ত রাখে এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তারা EPZ কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা করে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ করে থাকে।[২৫]

দক্ষিণ কোরিয়ায় EPZ স্থাপন

১৯৬০ এর দশকের শেষ দিকে দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করে। এ সময় শিল্পায়নখাতের সম্প্রসারণ দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতিকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য ১৯৬০-১৯৮০-র দশক পর্যন্ত সময়কাল দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে æDevelopmental Era” নামে পরিচিতি লাভ করে। এ সময় কোরীয় শ্রমিকগণ কম মজুরিতে কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশকে আরো সমৃদ্ধ করা এবং অধিক পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও Foreign Direct Investment বা FDI নীতির মাধ্যমে এর পররাষ্ট্রনীতিকে আরো শক্তিশালী করে তোলা। এ সময় কোরীয় সরকার কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে এবং Import Substitution (আমদানি বিকল্প) বিভিন্ন

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরির কারখানা নির্মাণ করতে থাকে। ২নং সারণীতে দেখা যায় যে, ১৯৭০-এর দশকে দক্ষিণ কোরিয়ার দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে ১৫.৬ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হতো এবং ১৯৮৭ সালের দিকে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০.১ শতাংশে উন্নীত হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের এত দ্রুত উন্নতি ও বিস্তারের পেছনে সস্তায় কাঁচামাল আমদানি, দেশীয় কাঁচামালের প্রাচুর্য, অতি সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ এবং এসব কিছুর সমন্বয়ে কারখানার উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সস্তায় ও আকর্ষণীয় মূল্যে বিদেশে রপ্তানিকরন প্রক্রিয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। ১৯৭০ সালে মাসানে এবং ১৯৭৩ সালে কোরিয়ার ইরি (Iri)-তে EPZ স্থাপনের মূল কারণ ছিল সস্তায় শ্রম সরবরাহ লাভ। এর ফলে এখানে অতি সহজেই বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, তন্তু এবং তৈরি পোশাক শিল্প বিকাশ লাভ করে। ২নং সারণীতে উল্লিখিত তথ্য থেকে আরো ধারণা করা যায় যে ১৯৬০ থেকে ১৯৮০-র দশকে কোরিয়ার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং এই বৃদ্ধির হার দ্রুত শতকরা ২০ শতাংশ অতিক্রম করে।

১৯৮৭ সালের জুন মাসে কোরিয়ার ছাত্রও শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং শ্রমিকেরা চুন ডু হোয়ান প্রশাসনের পদত্যাগ দাবি করে। এমতবস্থায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল রোহ্ তা-উ সামরিক আইন জারি করেন এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এ সময় রোহ্ তাঁর ১০ দফা সামজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেন।[২৬] এর ফলে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া কিছুটা ধীরগতিতে অগ্রসর হয়। এসময় দেশব্যাপী শ্রমিকরা ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে যা ইতিহাসে æGreat Labour Struggle” নামে পরিচিত। ফলে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ১৯৯৭-১৯৯৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা বা IMF Crisis এর ফলে এশিয়ার দেশগুলোও অর্থনৈতিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা বিশ্বে দক্ষিণ কোরিয়ার EPZ স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। এ সংকট Asian Financial Crisis নামে পরিচিত। এ সময় কোরীয় সরকার আন্তর্জাতিক অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে তার দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এছাড়া কারিগরি শিল্পকারখানা নির্মাণ এবং Foreign Direct Investment বা FDI নীতিকে উন্নয়নের বিকল্প ধারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ নীতি দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম সূতিকাগার হিসেবে কাজ করে। এ সময় ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সময়কালকে কোরিয়ার অর্থনৈতিক ইতিহাসের Developmental Era ঘোষণা করা হয় যার ফলে ১৯৯৮ সালের পর দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানির পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ

১৯৯০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানির পরিমান ছিল ৩০ শতাংশ যা ২০০৭ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭.৬ শতাংশে উপনীত হয়। ফলে কোরীয় সরকার এর সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের পরিমানও বৃদ্ধি করে। এভাবে ১৯৯০-এর দশকে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার যুগে দক্ষিণ কোরিয়ার বিদেশী বিনিয়োগ নীতি বিশ্বে দেশটিকে আরো জনপ্রিয় করে তোলে। একইভাবে ১৯৬২ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ৯৯,৫৩০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। অথচ ১৯৬২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণ কোরিয়ার Developmental Era চলাকালীন সময়ে Foreign Direct Investment বা FDI বিনিয়োগ করেছিল ৭,৮৭০ (৭.৯ শতাংশ) মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অপর দিকে ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই FDI খাতে বিনিয়োগ করে ৮১,৮৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ১৯৬২ সাল থেকে ২০০৪ সাল অবধি ৮২.৮ শতাংশের ও বেশি ছিল।[২৭]

২০০৪ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া এর FDI নীতিকে সম্প্রসারিত করার জন্য একের পর এক Free Trade Zones (FTZs) স্থাপন করতে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় মাসান এবং ইরির আদলে দক্ষিণ কোরিয়ার কুনসান, টেবুল, টোংহি এবং ইউলচোন প্রভৃতি অঞ্চলে মুক্ত বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ২০০০ সালে দেশটির বিভিন্ন সমুদ্রবন্দর, যেমন-পুসান, কাওয়ানগেয়ান এবং ইনচন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা স্থাপিত হয়।[২৮] নীচে একটি সারণীর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরনের পরিবর্তনের চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

Table 2. Changes of Exports and Export Dependency in Korea (%, million US dollars)

Year	Exports	Bonded Processing and Exports	Share of Bonded Processing and Exports to Total Exports	Export Dependency
1970	835.2	152.3	18.2	15.6
1971	106.6	208.8	19.6	16.6
1972	1624.1	285.3	17.6	20.9
1973	325.0	703.1	21.8	30.1
1974	4460.4	1064.8	23.9	28.4
1975	5081.0	1101.5	21.7	28.3
1976	7715.1	1578.1	20.5	31.3

1977	10046.5	1761.0	17.5	31.9
1978	12710.6	1609.0	12.7	30.3
1979	15055.6	1441.8	9.6	28.5
1980	17504.9	1630.1	9.3	35.1
1981	21253.8	2552.1	12.0	38.0
1982	21853.4	4089.6	18.7	36.9
1983	24445.1	4162.4	17.0	35.9
1984	29244.9	5162.3	17.7	36.3
1985	30283.1	5950.8	19.7	34.5
1986	34714.5	3115.6	9.0	38.0
1987	47280.9	3835.4	8.1	40.1
1988	66696.4	4980.9	7.5	37.6
1989	62377.2	4894.1	7.8	32.0
1990	65015.7	5438.3	8.4	29.1
1991	71870.1	4385.4	6.1	27.3
1992	76631.5	5059.7	6.6	27.4
1993	82235.9	3748.7	4.6	27.3
1994	96013.2	4326.7	4.5	27.4
1995	12058.0	6296.9	5.0	29.6
1996	129715.1	7403.9	5.7	28.7
1997	136164.2	9290.2	6.8	33.4
1998	132313.1	9931.8	7.5	47.8
1999	143685.5	11994.6	8.3	40.3
2000	172267.5	13907.3	8.1	42.3
2001	15439.1	9641.7	6.4	39.4
2002	162470.5	9925.8	6.1	36.6
2003	193817.4	11897.2	6.1	39.2
2004	253844.8	14086.4	5.5	45.4
2005	284418.7	20509.3	7.2	43.7
2006	325464.9	24467.9	7.5	44.7
2007	371489.0	29351.9	7.9	47.6

দ্রষ্টব্যঃ 1) Export dependency is the share of total export to GNI.

Source: Korean National Statistical Office, Statistics of Korean Economy; The Bank of Korea, Economic Statistics Yearbook.

কোরীয় EPZ-এ শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিক ইস্যু

১৯৭০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার মাসানে প্রথম EPZ স্থাপিত হয় এবং এটি ছিল বিশ্বের বৃহত্তম EPZ গুলোর মধ্যে একটি। এখান থেকেই দক্ষিণ কোরিয়া সবচেয়ে বেশি বিদেশী বিনিয়োগ করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে Foreign Direct Investment বা সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৭০ সালের দিকে যেসব খামার বা কারখানা স্থাপন করা হয় তার ৯০ শতাংশের মালিকানাস্বত্ব ছিল বিদেশী বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী। ১৯৮০-র দশকে এসে তা ৮০ শতাংশে নেমে আসে। এর মধ্যে জাপানের মালিকানা ছিল সবচেয়ে বেশি। এসব বিদেশী কোম্পানি দক্ষিণ কোরিয়ার মাসানে EPZ-এর পণ্যের গুণগত মান, সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ এবং শ্রমিকদের সুশৃংখলভাবে কাজ করার মানসিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়। এসময় তারা কোরীয় সরকার কর্তৃক প্রণীত ও কার্যকর হওয়া ১৯৭০ সালের æAct of Designation and Operation of Export Free Zones” এর আলোকে বিনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করে। তবে ১৯৮৭ সালে কোরিয়ায় সংঘটিত শ্রমিক সংগ্রামের পর থেকে শ্রমিক অধিকার এবং তাদের বেতন কাঠামো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৯০ এর দশক পর্যন্ত অনেক ছোট ছোট বিদেশী কোম্পানি তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। এভাবে বিদেশীদের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে মাসান EPZ-এর কর্মকান্ডে সন্তুষ্ট হয়ে দেশীয় শিল্প ও পুঁজিপতি শ্রেণী কোরীয় EPZ-এর বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত খাতে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। এছাড়া ১৯৯৮ সালের IMF Crisis বা এশীয় অর্থনৈতিক সংকট এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে।[২৯] নীচে একটি সারণীর মাধ্যমে মাসান রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকায় বিভিন্ন সময় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রের পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

Table 3.Trend of Employment Changes in Masan:

Year	Female	(%)	Male	(%)	Total
1972	6,052	85.2	1,052	14.8	7106
1973	17,275	81.3	3,965	18.7	21240
1974	15,196	73.0	5626	27.0	20822
1975	17,026	75.4	5560	14.6	29953
1976	22,787	76.1	7166	23.9	29953
1977	22,927	74.6	7792	25.4	30719

1978	23,298	75.3	7662	24.7	30960
1979	23,280	74.7	7873	25.3	31153
1980	22,183	77.7	6349	22.3	28532
1981	21,782	77.7	6234	22.3	28016
1982	20,029	77.0	5983	23.0	26012
1983	24,491	79.0	6498	21.0	30989
1984	26,697	78.9	7176	21.1	33856
1985	22,342	77.0	6647	23.0	28983
1986	27,018	77.5	7865	22.5	34883
1987	28,022	77.0	8389	23.0	36411
1988	24,975	75.5	8015	24.5	33080
1989	16,595	71.9	6481	28.1	23076
1990	13,187	67.2	5799	32.8	19616
1991	12,296	69.3	5445	30.7	17741
1992	11,683	68.2	5504	31.8	17142
1993	10,555	67.0	5198	33.0	15753
1994	10,613	66.9	5338	33.1	16137
1995	9,613	65.2	5123	34.8	14736
1997	8,106	63.1	4744	36.9	12850
2001	7,377	61.5	4681	38.5	11995

দ্রষ্টব্য: Administraation officer, Masan Free Export Zone, "The status of Masan, Export Free Zone, 2002".

ওপরের সারণীর মাধ্যমে মাসান EPZ-এ পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক নিয়োগের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সারণীতে উল্লিখিত তথ্যানুযায়ী শ্রমিক অধিকার ও বেতন কাঠামো বৃদ্ধির সাথে সাথে কোরীয় EPZ গুলোতে শ্রমিক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তা ৩৬,৪১১ জনে উন্নীত হয়। এভাবে ১৯৭০-এর দশক থেকে ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত কোরীয় সরকার যে Developmental Era ঘোষণা করেছিল তার বিভিন্ন দিকের বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে থাকে এবং এসময় পর্যন্ত প্রায় ৭৫ শতাংশ মহিলা শ্রমিক কর্মরত ছিল যার মধ্যে ৯০ শতাংশই ছিল ২০ বছর বয়সী অবিবাহিত তরুণী।[২৯] এসব মহিলা শ্রমিক পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে শতকরা ৪১ থেকে ৪৬ শতাংশ বেতন কম পেতো এবং তা দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতো না।[৩১] সুতরাং কোরীয় Developmental Era-র বাস্তবায়ন ঘটে অতি সস্তায়

অবিবাহিত তরুণী শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় সমগ্র কোরিয়ায় প্রতিবাদী শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৮৭ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২২, ১৯৮৮ সালে ৩৭, ১৯৮৯ সালে ৪৩, ১৯৯০ সালে প্রায় ৪০-এ উন্নীত হয়। এভাবে শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৮৮-১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই ৩ বছরে ২০-৩০ বার এসব কারখানায় শ্রমিক দাঙ্গা সংঘটিত হয়।[৩২] তবে সবচেয়ে বড় ধরণের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় পুরুষ শ্রমিক কারখানায় যেখানে পুরুষ শ্রমিকেরা ভারী যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পণ্য নির্মাণ কারখানায় কর্মরত ছিল।[৩৩] কিন্তু প্রকৃত শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করে মাসান EPZ-এ কর্মরত অবিবাহিত তরুণী শ্রমিকরা এবং তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিভিন্ন কারখানাতে শ্রমিক অসন্তোষ দানা বেধে ওঠে।

এর পরবর্তীতে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং EPZ গুলোতে সৃষ্ট শ্রমিক অসন্তোষের কারণে সকল শ্রমিকের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং কর্ম পরিবেশেরও ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৮৬ সালের হিসেব অনুযায়ী কারখানার শ্রমিকদের বেতন ১৫৭,৯৫৪ ওন (১৮৩ মার্কিন ডলার) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬৭,৫৪৪ ওন (৪২৭ মার্কিন ডলার)-এ উন্নীত হয়। এভাবে আস্তে আস্তে বেতন ও মজুরী বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৭ সালে ২১৫,০০০ ওন (২৭১ মার্কিন ডলার)-থেকে ৪৫২,০০০ ওন (৫৭১ মার্কিন ডলার) এবং ১৯৮৯ সালে ৪১৪,০০০ ওন (৬০৯ মার্কিন ডলার) থেকে ৭৩৪,০০০ ওন (১০৮০ মার্কিন ডলার)-এ উন্নীত হয়। অর্থাৎ এই বেতন বৃদ্ধির হার এই ৩ বছরে ১৯৯.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬২.১ শতাংশে উন্নীত হয়।[৩৪] অবশ্য এভাবে দ্রুত বেতন বৃদ্ধির পরও নারী-পুরুষের বেতন বৈষম্য অব্যাহত থাকে।

মাসান EPZ-এ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি এবং সরকার প্রণীত ও বাস্তবায়িত কঠোর নিয়মের কারণে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগ করতে অনীহা প্রকাশ করে। এতে কারখানাগুলোর কর্ম পরিবেশেরও অবনতি ঘটে। এসময় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা নতুন করে অথবা পুনরায় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকে এবং ছোট ও মাঝারি রপ্তানি জোন গুলোতে বিকল্পভাবে বিনিয়োগের পথ অনুসন্ধান করতে থাকে।[৩৫] মাসান EPZ-এর বিপর্যয়মূলক পরিবর্তনের ধারা ২০০১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর ফলে প্রতিবছর এখান থেকে শ্রমিক নিয়োগের হার ১২.৫ শতাংশ থেকে ৭৮ শতাংশে নেমে যায়। এ হার বার্ষিক মোট জাতীয় শ্রমিক নিয়োগের ৬.৪ থেকে ৪.০ শতাংশের বেশি নয়। এছাড়া চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগকৃত শ্রমিকের সংখ্যাও ১৭.৯ শতাংশে নেমে যায়, যেখানে মোট জাতীয় শ্রমিক নিয়োগের ৫১ শতাংশ ছিল।[৩৬] একইভাবে মাসান EPZ এ সময় শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়।

কারণ অন্যান্য শিল্প পণ্য উদ্যোক্তা গোষ্ঠী দক্ষ ও পুরাতন শ্রমিকদেরকে উন্নত পণ্য উৎপাদনের জন্য ১,৫৭৮,০০০ ওন (১১৯০ মার্কিন ডলার) এর পরিবর্তে ২,৪১৮,০০০ ওন (১৮২৩ মার্কিন ডলার) প্রদান করা হয় যা বার্ষিক মোট জাতীয় বেতন অপেক্ষা অনেক বেশি।[৩৭]

এভাবে মাসান EPZ-এ শ্রমিক অসন্তোষের ফলে অবিবাহিত তরুণী শ্রমিকেরাও অসন্তোষ প্রকাশ করে। অথচ এসব শ্রমিকরাই ছিল মাসান EPZ পরিচালনার মূল চাবিকাঠি। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সময়কালে এখানে ১০ বার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালে একই বছর ৪ বার এবং ২০০০-২০০১ সালে আরো ২ বার শ্রমিক অসন্তোষ দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ সালের মহিলা শ্রমিকদের অসন্তোষই এই আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করে।

পূর্বের আলোচনায় দেখা গেছে যে, ১৯৮৭ সালের পূর্বে দক্ষিণ কোরিয়ার রপ্তানি পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবিবাহিত তরুনী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল অধিক এবং তাদের বেতন কাঠামো অনেক কম ছিল। এসব অবিবাহিত তরুণী শ্রমিক ‘শ্রমিকসংঘ’ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে এসব শ্রমিক পরবর্তীতে তাদের ইচ্ছেমত চাকুরিতে দায়িত্ব পালন করতে পারতো এবং সুবিধামত ত্যাগ করে অন্য কোন খামারে কাজ করতে পারতো। অন্যদিকে গৃহসামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে অনেক বিদেশী কোম্পানি মাসান EPZ-এর অনুকরনে শ্রমিক সংগ্রহের জন্য অধিক মজুরি প্রদানের ঘোষণা প্রদান করে। এর ফলে সস্তায় কর্মরত ঐসব শ্রমিক খুব দ্রুত এসব বিদেশী খামারে কাজ করার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানের বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদনকারী একটি কোম্পানি ১৯৭২ সালে মাসান EPZ-এ বিনিয়োগ করে। ১৯৯০ সালে এই কোম্পানিটি থাইল্যান্ডে এবং ১৯৯৯ সালে চীনে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। এই দুই দেশের শ্রমিকদেরকে স্থানীয় শ্রমিক অপেক্ষা ৩ গুন এবং দক্ষিণ কোরিয়া অপেক্ষা ৭ গুন বেশি বেতন প্রদান করা হতো।[৩৮]

বিশ্বায়নের প্রভাবের ফলে দক্ষিণ কোরিয়াও এর EPZ খাতের মজুরি ও কর্মপরিবেশের সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করে এবং দেশটি শিল্পপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কারিগরি জ্ঞান ও অধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যয় করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আবির্ভূত হয়। একই সাথে তারা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও স্থায়ী নিয়োগ দুই পদ্ধতিতেই শ্রমিক নিয়োগ করার প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে। ফলে শিল্পায়ন খাত দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণের ফলে কারখানাগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। পরবর্তীতে দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম ব্যবস্থায় মজুরির

ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ শ্রমিকের বৈষম্য হ্রাস পায়। বিশেষ করে, সস্তায় মহিলা শ্রমিক নিয়োগের নীতি বাতিল করা হয় এবং এভাবে সকল শ্রমিকের প্রতি সমান যোগ্যতা ও মূল্যায়নের নীতির উন্মোচন ঘটে।

বাংলাদেশে EPZ-স্থাপন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিদেশী বিনিয়োগকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই বিনিয়োগ কেবলমাত্র সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগই ছিল না বরং তা বিভিন্ন কোম্পানি ও দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ কারণে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মিশ্র পরিবর্তন অনুভূত হয়। এ সময় সরকারি মালিকানার পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে শুরু করে। জাতীয়করন প্রক্রিয়া পরিত্যক্ত হয় এবং এভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা হয় এবং সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশের সরকার বিদেশী বিনিয়োগের অধীনে EPZ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৩৯] আলোচনার এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে EPZ স্থাপনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। অবশেষে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে Bangladesh Export Proceessing Zone Authority (BEPZA) Act এবং Foreign Direct Investment (Promotion and Protection) Act পাস করা হয়। BEPZA-র তথ্যানুসারে ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রাম এবং ১৯৯৩ সালে ঢাকাতে প্রথম EPZ স্থাপিত হয়। তবে চট্টগ্রামে EPZ-এর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬ টি EPZ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরো ২টি EPZ নির্মাণাধীন রয়েছে। BEPZA-র সূত্রানুযায়ী ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকার বেসরকারিভাবে EPZ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে। ২০০৮ সালের মার্চ মাসের BEPZ-র সূত্রানুসারে বাংলাদেশের EPZ গুলোকে ২৭৬ টি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। এসব EPZ-এ প্রায় ২১১,৮২৯ জন শ্রমিক কাজ করে এবং প্রতিবছর শ্রমিকদের বেতন বাবদ ১,৩৭৪.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করা হয়। তবে এসব EPZ-এর ৬০ ভাগ বিদেশী মালিকানায় পরিচালিত হয়। এগুলোর মধ্যে ১৭ ভাগ বিদেশী বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী কর্তৃক এবং ২৩ ভাগ স্থানীয় জনগন ও বিদেশী বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে যৌথমালিকানায়

পরিচালিত হয়। বিদেশী বিনেয়োগকারী গোষ্ঠীর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম। এর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জাপান এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে চীন। তবে চীনের সাথে হংকংও এ প্রক্রিয়ায় জড়িত। ১৭৯টি EPZ কারখানার মধ্যে অধিকাংশই তৈরি পোশাক শিল্প, তন্তু উৎপাদন প্রভৃতি পণ্য তৈরি করে। এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকের হার শতকরা ৬৪.৯ শতাংশ। বাংলাদেশী এসব পোশাক নির্মাণ কারখানায় সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করে এবং দেশের মোট কর্মজীবি মানুষের শতকরা ৭৪.৮ শতাংশ থেকে ৮৩.০ শতাংশ জনশক্তি কর্মরত রয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশেও EPZ স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের EPZ স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় ও বিদেশী বিনিয়োগ, রপ্তানির ধরণ উন্নতকরণ ও পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ঘাটতি/শূন্যতার সমন্বয় তৈরি, বিভিন্ন প্রজন্মের জনগণের কর্মসংস্থান তৈরি, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, আর্ন্তজাতিক বাজার তৈরি প্রভৃতি বিষয়কে নির্বাচিত করা হয়। বাংলাদেশও উল্লিখিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দানের উদ্দেশ্যে EPZ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্প্রতি বাংলাদেশের EPZ গুলোতে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর হ্রাস করার ঘোষণা প্রদান করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নির্মাণ সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানি, ভারী যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন পণ্যের অবাধ আমদানি-রপ্তানি, দ্বৈত কর পরিহার, অতিরিক্ত কর হ্রাস প্রভৃতি। এছাড়া EPZ স্থাপনে আগ্রহী দেশগুলোকে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ সুবিধা বা Generalised System of Preferences (GSP) Facility প্রদানের ঘোষণা প্রদান করে। EPZ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে EPZ বিষয়ক গবেষক জনাব দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য লিখেছেন,"...................although the EPZs were continuing to make a modest contribution to the economy in terms of investment, job creation and export-earnings, they definitely demonstraing more dynamism than the rest of the ecnomy."[৪০] তাঁর মতে, এই নীতি অনুসরণ করার ফলে বাংলাদেশের EPZ খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং BEPZA-র ইতোপূর্বের সমস্ত ঘাটতি পূর্ণ হয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমান মূলধন জমা হয়।

১৯৭৮ সালে মহিলা শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প প্রথম যাত্রা শুরু করে। এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার কারিগরি সহায়তায় 'দেশ গার্মেন্টস্ লিমিটেড'(Desh Garments Ltd.) স্থাপিত হয় এবং এভাবে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানা স্থাপনের শুভ সূচনা হয়।[৪১] 'দেশ গার্মেন্টস্ লিমিটেড' স্থাপন এবং এতে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ

বাংলাদেশর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং দেশের মহিলা শ্রমিক, যারা সমাজে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ছিল, তারা একটি শক্তিশালী জনশক্তি হিসেবে আর্বিভূত হয়। এভাবে দেশগার্মেন্টস্কে অনুসরন করে স্থানীয় পোশাক শিল্প-কারখানা গুলোতেও দ্রুত মহিলা শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং রীতি-নীতি রপ্ত করতে থাকে। এভাবে পোশাক তৈরি শিল্প আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করে এবং তা রপ্তানি ও তৈরি পোশাক বাজারজাতকরন এবং তন্তু ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি কাজের জন্য EPZ স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়।[৪২] বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৬০০০ তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন কারখানা অবস্থিত যার ৬৫টি EPZ ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং এসব EPZ জাতীয় অর্থনীতির শতকরা ১শতাংশ চাহিদা পূরণ করে থাকে। অবশ্য এসব EPZ-এর পরিচালনা পদ্ধতি, ধরণ এবং বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে EPZ ব্যবস্থার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে গার্মেন্টস্গুলোর মালিকানা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাতে চলে যায় এবং ১১৯টি গার্মেন্টস্ নিবন্ধনভুক্ত রয়েছে যার মধ্যে ৫৩.৪ শতাংশের মলিকানা সম্পূর্ণভাবে বিদেশীদের এবং ২৭.৭ শতাংশের মালিকানা বাংলাদেশের নাগরিকদের এবং ১৮.৫ শতাংশের মালিক স্থানীয় ও বিদেশী যৌথ বিনিয়োগকারী গোষ্ঠী। তবে EPZ-এ নিবন্ধনভুক্ত এবং নিবন্ধন বহির্ভূত শ্রমিকদের বেতন কাঠামোর মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৪৩] এজন্য এসব EPZ-এ প্রায়ই শ্রমিক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এর কারণ হিসেবে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা- প্রথমতঃ EPZ এর কারখানাগুলোর বিশালত্ব ও ব্যাপকতা এবং এখানে ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে এবং উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে স্থানীয় মালিকানাধীন এবং EPZ নিবন্ধন বহির্ভূত অনেক গার্মেন্টস্ই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেও তার পরিচালনা পদ্ধতি ও অফিস ব্যবস্থাপনায় এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি আধুনিকতার ছোয়া স্পর্শ করেনি।

দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের EPZ গুলো কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় নিবন্ধনকৃত ও নিবন্ধন বহির্ভূত গার্মেন্টস্ সমূহের শ্রমিকদের বেতন কাঠামো অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন কারণে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের EPZ গুলোতে শ্রমিক ইউনিয়ন পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কারখানাগুলোর বেতন রীতি-নীতি এবং সুযোগ-সুবিধা থেকে বাংলাদেশের শ্রমিকদের বেতন রীতি-নীতি ও সুযোগ-সুবিধার ধরণ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে এবং এখানে বেতন ও সুযোগ-সুবিধার পরিমাণও কম রয়েছে। এখানে

বিশ্বের অন্যান্য দেশের EPZ-এর কারখানা শ্রমিকদের চাইতে অপেক্ষাকৃত কম সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। তবে এসব মজুরীর পরিমাণ নিবন্ধন বহির্ভূত কারখানার শ্রমকিদের থেকে বেশি। পর্যবেক্ষক মহল এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, EPZ গুলোতে যদি কর্মপরিবেশ উন্নত হয় এবং বেতন কাঠামো আরো উন্নত করা যায় তাহলে EPZ কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ থাকবে না। অবশ্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্নভাবে EPZ কারখানাগুলোতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৬৫ সালের 'Employment of Labor Act'(Standing Orders) এবং ১৯৬৯ সালের 'Industrial Relations Ordinance' জারি করে। এ কারখানা আইনটি ১৯৬০ সালের শ্রমিক আইনের পরিবর্তিত সংস্করন। সুতরাং কারখানাগুলোতে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুবিধা না থাকায় এখানে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কিছুটা হ্রাস পায়। EPZ থেকে এত দ্রুত শ্রমিক সংঘ বিলুপ্ত করার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশের EPZ নীতি সম্বন্ধে সমালোচনামূলক মন্তব্য আসতে থাকে। সুতরাং অধিকাংশ দেশই ILO রীতি বিরোধী বাংলাদেশের শ্রমিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং খোলাখুলিভাবে খুব কমই বাংলাদেশের EPZ গুলোতে পুঁজি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করে।[৪৪]
শ্রমিক সংঘ বিলুপ্ত করার পর থেকে BEPZA-র পক্ষ থেকে EPZ শ্রমিকদের শান্ত রাখার জন্য বিকল্প পন্থা অবলম্বন করে এবং BEPZA কর্তৃপক্ষ Industrial Relations Ordinance-এর জারির মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ দমন করার নীতি গ্রহণ করে। এ কারণে বাংলাদেশের EPZ বিষয়ক গবেষক জনাব আসিফ দৌলা (Asif Dowla) BEPZA-র Industrial Relations Depertment সম্বন্ধে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, æIndustrial Relations Depeartment (Bangladesh) has been accused of creating work related problems with an aim of collecting bribes from investors. In this view, the higher wages offered in the EPZ have been offset by weak job security and by inadequate medical benefits shop floor level".[৪৫]
তবে শ্রমিক সংঘ বিলুপ্তকরনের ফলে বাংলাদেশের EPZ কর্তৃপক্ষের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা থেকে বড় ধরণের চাপ আসতে থাকে। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে শ্রমিক সংঘ বিলুপ্তকরনের আগে বিষয়টি পুর্ণবিবেচনার আহবান জানায়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯১ সালে একটি বড় দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বাজারে Generalised System of Preference (GSP)-এর আওতায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস্ পণ্য কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার অনুমতি প্রদান করে। একই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের American Federation of Labor and Congress of Indurstrial Organization (AFL-CIO) একই রকম ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি পোশাক প্রবেশাধিকার অনুমতি প্রদান করে। এ সময় U.S Trade Representative (USTR) বাংলাদেশ সরকারকে খুব দ্রুত ILO রীতিতে EPZ-গুলোতে শ্রমিক সংঘ স্থাপনের আহবান জানায়। ২০০১ সালে GSP-এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য প্রবেশের জন্য আরো ৩ বছর সময় বর্ধিত করা হয়। তবে এ সময় বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকার করে যে, ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি শ্রমিক সংঘ গঠনের অনুমতি প্রদান করবে। কিন্তু এ সময় বাংলাদেশের অন্যতম বড় বিনিয়োগকারী দেশ হিসেবে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া EPZ গুলোতে শ্রমিক সংঘ গঠনের ঘোর বিরোধিতা করে। ফলে বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত কোন শ্রমিক সংঘ গঠন করতে না পারার দরুন AFL-CIO এবং USTR কোটামুক্ত পণ্য প্রবেশাধিকারের অনুমতি প্রত্যাহার করে নেয়। এভাবে দুই বৃহৎ শক্তির চাপে পড়ে বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালের জুলাই মাসে EPZ Workers Association and Industrial Relations Act তৈরি করে। এই আইনের আওতায় Workers Representation and Welfare Committee' (WRWC) গঠনের অনুমতি প্রদান করা হয় যেখানে শ্রমিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করবে এবং এসব প্রতিনিধি EPZ কর্তৃপক্ষের সাথে বিভিন্ন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। এ আইনের আওতায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, ২০০৬ সালের নভেম্বর WRWC Workers Association-এ রূপান্তরিত হবে। এভাবে শ্রমিক সংস্থা গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বৃহৎ শক্তির চাপ প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। এর ফলে বিদেশী বিনিয়োগকারীগোষ্ঠী আবার দেশটিতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। শ্রমিক সংগঠন (Workers Association) গঠনের পর বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে EPZ স্থাপিত হয়। এসব EPZ গুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয় যাদের অধিকাংশই ছিল তরুণী ও বিধবা। সমাজের অবহেলিত, অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত এসব মহিলা শ্রমিক নিয়োগের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং বাংলাদেশের বেকার জনগণের কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র তৈরি হয়। এসব শ্রমিক

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠন তাদের পূর্বের Trade Union এর আদলে শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশের EPZ শ্রমিকদের বেতন কাঠামো ও সুযোগের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়। এরপরও শ্রমিক অসন্তোষ অব্যাহত থাকে এবং এই ধারাবাহিকতায় ২০০৬ সালের মে মাসে ঢাকা EPZ-এ শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। এভাবে ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিহতকরনের মাধ্যমে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ব্যাপক পরিবর্তন আসে এবং WRWC/Workers Associations বাংলাদেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে।

বাংলাদেশে কোরীয় EPZ স্থাপন

বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৪টি EPZ ইউনিট তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার মধ্যে ৬০টি ইউনিট সরাসরি শিল্পজাত পণ্যের আমদানি রপ্তানি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশে কোরিয়ার রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকার ওপর গবেষণামূলক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশী গবেষক জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ। তাঁর মতে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ, মাধ্যমিক পর্যায়ের পণ্য উৎপাদন এবং দেশ ও বিদেশে মাধ্যমিকমানের বাজার দখল প্রভৃতি বিষয় বাংলাদেশে EPZ স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮০ সালের বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এক আইন পাশের দ্বারা ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে EPZ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, Bangladesh Export Processing Zones Authority বা BEPZA কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের EPZ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

বাংলাদেশে কোরীয় EPZ স্থাপনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াংগানে কর্পোরেশন (Youngone Corporation) প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৫ সালের মে মাসে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট-এর মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশে কোরীয় EPZ-এর যাত্রা শুরু হয়। এ আলোচনার ফলশ্রুতিতে ইয়াংগানে কর্পোরেশনকে বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রণালয় ১০২২ হেক্টর বা ২৫২৬ একর ভূমি ইজারা হিসেবে প্রদান করে। সময়ের ব্যবধানে দক্ষিণ কোরিয়া ২০০৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ২৯৩.৮২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে যার ফলে প্রায় ৬৫,৮২৮ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন কোরীয় কারখানাতে অসংখ্য বিদেশী নাগরিক কর্মরত আছে। এসব EPZ লাভজনক প্রমানিত হবার ফলে সাম্প্রতিক

বছরগুলোতে বহুসংখ্যক কোরীয় ব্যবসায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন EPZ পরিদর্শন করেছেন এবং তারা বাংলাদেশের তন্তুশিল্প বিশেষ করে, তৈরি পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ কোরীয় সরকার এই উদ্যোগকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সরাসরি ৬০টি ইউনিট EPZ পরিচালনা করে এবং ১৪টি অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে। কতিপয় কোরীয় বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে EPZ পরিচালনা করেন এবং তারা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানী, কয়লা, গ্যাস, কম দামের গৃহ নির্মাণ সামগ্রী, পাটকেলবোর্ড, তন্তু, তৈরি পোশাক, বোতলজাত বিশুদ্ধপানি, বেভারেজ সামগ্রী ও আইসক্রীম তৈরি খাতে বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।[৪৬] নীচের সারণীতে বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন কোরীয় EPZ-এ কোরীয় বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

Table 1. Country Wise Investment & Employment (industry in operation) (As of December 2006)

SL.	Country	No of Unit	Inv. (000 Us$)	Employ.(L)	Employ.(F)
1	Bangladesh	56	175357.801168	35230	44
2	Belgiam	1	1152.10953	185	-
3	Br. Virgin.Is.	2	4192.8487	1842	23
4	Canada	2	1978	220	4
5	China	8	11862.0137426	4407	24
6	Denmark	1	1030	239	7
7	France	1	803.42	-	-
8	Germany	4	19970.7317	4359	47
9	Hongkong	19	113910.03282	26271	312
10	India	15	5118.14243	2431	13
11	Indonesia	1	3592.49691	-	-
12	Ireland	1	3	15	1
13	Italy	2	16143.841565	922	7
14	Japan	24	128573.364092	5539	34
15	Malaysia	7	73309.48239	6688	156
16	Nepal	1	50	-	-
17	Netherlands	3	10476.344185	562	12
18	Pakistan	5	4029.1632945	804	-

19	Panama	1	2652.9525561	2309	24
20	S.Korea	60	282436.915285	67046	189
21	Singapore	2	3115.84.385	58	2
22	Sweden	1	6862.6882	4564	24
23	Switzerland	1	1919.26279	10	-
24	Taiwan	10	42210.9086157	4412	53
25	Thailand	1	513.2	-	-
26	U.S.A	12	51086.10546	102884	63
27	United Kingdom	10	28339.62528	7910	48
	Local Invest.(B.Type)	-	50193.1279381	-	-
	Total	252	1053083	187307	1087

উৎস: Bangladesh Export Processing Zone Authority.

Table 2: Product wise Investment & Employment (Industry in operation) (As December 2006)

SL.	Product	No of Unit	In. (000 US$)	Employ. (Local)	Employ. (Foreign)
1	Agro Product	10	2828.222	521	5
2	Caps	7	44667.48131	12103	70
3	Chemical &Fertilizer	-	410.00705	-	-
4	Eluctronics & Electrical	16	51667.48702	3115	19
5	Fishing Reel & Gulf Equipment	1	31249	545	1
6	Foot ware & Leather Goods	11	51604.45719	5550	14
7	Garment Accessories	32	101912.34204	6228	75
8	Garments	52	263006.16008	100915	368
9	Kniting & Textile products	24	92567.892199	19773	211

10	Metal Products	12	20555.67759	781	18
11	Miscellaneous	19	28082.81618	4226	13
12	Paper Products	2	837.1699	74	-
13	Plastic Good	13	20981.346116	853	6
14	Ropes	2	6110	393	2
15	Service Orinented Industries	3	5280.41546	472	2
16	Tent	5	23427	5161	17
17	Terrytowel	16	36630	4837	11
18	Textile	27	252916.886372	21760	253
19	Toys	-	349	-	-
	Total	252	103583.36050	187307	1087

উৎস: Bangladesh Export Processing Zone Authority.

Table 3. Type of Enterprises (as of December 2006)

Type	Units (no)	Investment ('000'US$)	Local Employment (no)	Foreign Employment (no)
A	155	764081.34002	132718	976
B	41	98644.219319	18359	67
C	56	175357.801168	3623	44
Total	252	1035083	187307	1087

উৎস: Bangladesh Export Processing Zone Authority.

বাংলাদেশে EPZ স্থাপনে দক্ষিণ কোরিয়ার আগ্রহের কারণ

সকল প্রকার জটিল সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করতঃ BEPZA কর্তৃপক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে অধিক বিনিয়োগ করার আহবান জানায়। উল্লেখ্য যে, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আরো বেশি পরিমান বিনিয়োগে আগ্রহী করে তোলা কেবলমাত্র BEPZA-র মাধ্যমেই সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ EPZ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অধিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সরকার একুশ শতকের শুরুতে নতুন নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এই আইনের আওতায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করা এবং তিন বছরের জন্য দ্বৈতকর প্রদান করা থেকে অব্যাহতি লাভ করবেন। আবার যন্ত্রপাতি কারখানা সংক্রান্ত যন্ত্রাংশের জন্য

শূল্কমুক্ত বা শুল্ক হ্রাসসহ লভ্যাংশ রেমিট্যান্স হিসেবে প্রেরণ করতে পারবেন এবং প্রযুক্তিগত ও কনসালট্যান্সি ফিস প্রদান করা থেকে ছাড় লাভ করবেন। এছাড়া কোম্পানির ১০০ ভাগ মালিকানা স্বত্ব লাভ, বিদেশী বিনিয়োগের ওপর কর প্রত্যাহার এবং মূলধন বিনিয়োগের শতকরা ১০০ ভাগ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। ১৯৮০ সালের Foreign Private Investment Act অনুসারে বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের মূলধনের নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করা হয় যাতে আশ্বস্ত হয়ে বিদেশী বিনিয়োগকারীগোষ্ঠী ত্রাণ সহায়তা প্রদানের মত বিনিয়োগের হাত প্রসারিত করে। এক্ষেত্রে তারা বেসরকারি খাতে বীমা প্রকল্প চালু করার প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করে। উদাহরণ হিসেবে এক্ষেত্রে American Life Insurance-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের জন্য International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) বাংলাদেশে গঠন ও চালু করার পর দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে এর বিনিয়োগের দ্বার উম্মোচন করে।[৪৭]এক্ষেত্রে বাংলাদেশের EPZ ব্যবস্থাপনা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য লাভজনক পরিবেশ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর কারণ হলো বাংলাদেশে সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব। বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের বাজারব্যবস্থা আকর্ষণীয় হওয়ার অন্যতম কারণ হলো এ দেশের সস্তামূল্যে শ্রমশক্তির সরবরাহ যা শিল্পায়নের জন্য সব চাইতে প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ, যেমন- ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইনেও একইভাবে সস্তায় শ্রমিক সংগ্রহ করা সম্ভব। আবার বাংলাদেশে উৎপাদন ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন খরচও অনেক কম। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ একটি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় বিদেশী বিনিয়োগকারীরা দেশটিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত হওয়ার ফলে সমুদ্র পথে এখান থেকে অতি সহজেই পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপের দেশগুলোতে প্রবেশ করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে আকর্ষণ করে। এসব অনুকূল ও সুবিধাজনক দিক বেসরকারি খাতে বাংলাদেশে EPZ স্থাপনের ভিত্তি রচনা করেছে। ফলে অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীদের মত দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োকারীগণও বাংলাদেশে EPZ স্থাপনের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। এভাবে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের চট্রগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তীরে অতি সম্প্রতি কোরীয় EPZ স্থাপন করে। প্রায় ২৬০০ একর আয়তন বিশিষ্ট এই EPZ টি পরবর্তী ২ বছর তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার লাভ করে।[৪৮]

তথ্য নির্দেশ:

১. Helal Uddin Ahmed, æEPZs of Bangladesh Promises Galore” in *The Korea Post*. Vo 120 No 3. March 2007, P.L.6

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. Linda Lim Y.C.(1984) "Labour and Employment Issues in Export Processing Zones in Developing Countries," in Eddy Lee (ed.), *Export Processing Zones and Industrial Employment in Asia,* [Bankok,ILO, :Asian Employment Programme (ARTEP),]

৫. Dennis Shoesmith (ed.), (1989): *Export Processing Zones in Five Countries: The Economic and Human Consequence*, [Honkong: Asian Partnership for Human Development].

৬. Jean Currie (1979) *Investment* : *The Growing Role of Export Processing Zones.* [London: The Economic Intelligence Unit].

৭. Kwan-Yiu Wong and David K.Y.Chu(1984) "Export Processing Zones and Special Economic Zones as Generators of Economic Development : The Asian Experience 1, *Geografiska Annaler*, 66 B, PP. 1-16.

৮. Gunter, Bernhard G., and RolphVan der Hoeven. (2004). "The Social Dimension of Globalizatiion : A Review of the Literature" *International Labour Review*, Vol-143, No.-1-2.,2004.

৯. www.wepzza.org

১০. www.shanonireland.com

১১. Currie, Investment

১২. Dorsati Madani (1999), *A Review of the Role and Impact of Export Processing Zones* Policy Research Working Paper, (The World Bank).

১৩. Kankesu Jayanthakumarn, (2003), "Benefit-Cost Appraisal of Export Processing Zones: A Survey of the Literature" *in Development Policy Review*, Vol. 21, No. 1, pp. 51-65.

১৪. Dorsati, *Export Processing Zones.*

১৫. Wong and Chu, æThe Asian Experience"pp.1-16; আরো দ্রষ্টব্য, A. Denis Rondinelli (1987) "Export Processing Zones and Economic Development in Asia: A Review and Reassessment of a Mens of Promoting Growth and Jobs", *American Journal of Economics and Sociology*, Vol.46, No.1,pp 89-10. Dorsati, *Export Processing Zones*,

১৬. Wong and Chu, "The Asian Experience". pp. 1-16.

১৭. Rondinelli "Export Processing Zones" pp. 89-105.

১৮. Eddy Lee (1984) 'Introduction' in Eddy Lee (ed.), *Export Processing Zones and Industrial Employment in Asia,* [Bangkok, ILO: Asian Employment Programme (ARTEP)]

১৯. প্রাগুক্ত

২০. Gus Edgren (1984), "Spearheads of Industrialisation or Sweatshops in the Sun?" in, Eddy Lee, (ed.), *Export Processing Zones and Industrial Employment in Asia,* [Bangkok, *ILO:* Asian Employment Programme (ARTEP)]

২১. দ্রষ্টব্য, Asia Monitor Resource Center, 1998. 7-9, p-17.

২২. Shoesmith *Export Processing Zones*.

২৩. ILO (1998a) *Labour and Social Issues Relating to Export Processing Zones,* (Geneva: ILO).

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. Shoesmith *Export Processing Zones*.

২৬. রোহ্ তা-উ-র ১০ দফা সংস্কার কর্মসূচির জন্য দ্রষ্টব্য-Ecarter J. Carter et.al (1990) *Korea Old and New: A History* (Seoul: Ilchhokak).

২৭. Kyusik Bac (2005) *Study on the Industrial Relations of Foreign Invested Companies in Korea (* Seoul*:* Korea Labour Institute).

২৮. Jaegon Park (2008) "The Direction of Free Trade Zone Policy" *in Industrial Ecnomic Review,*2008.

২৯. প্রাগুক্ত এবং আরো দ্রষ্টব্য, Heaboem Choi, (2003), "Study on the Development Direction on Masan Free Trade Zone" *Hanguk Hangman Kyoungjea Hakhoeaji,* Vol. 19, No 1.

৩০. Insun Kang (1986), "The Actual working Conditions of Unmarried Female Workers in Masan Export Free Zone" *Social Studies,* Vol.2

৩১. Korea Institute for Industrial Ecnomics and Trade [KIIET], (1990), *Study on the Developmental Plan of Masan Export Free Zone.*

৩২. Masan Free Trade Zone Corporate Association (2002) [MFTZCA], *The Report on the Status and Problems of the Industrial Relations in Masan Free Trade Zone.*

৩৩. Nobuka Yokata (1994), "The Structural Changes of Labour Market in Korea in the 1980s: The Case of Male Workers in the Manufacturing" *Ajia Keizai,* Vol.35, No.10

৩৪. KIIET, *Masan Export Free Zone.*

৩৫. Masan Free Trade Zone Corporate Association (2002) *Masan Free Trade Zone.*

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. প্রাগুক্ত, p-18.

৩৯. Asif Dowla (1997), "Export Processing Zones in Bangladesh: The Economic Impact" *Asian Survey,* Vol.37, No.6. p-62.

৪০. Debapriya Bhattacharya (1998), *Export Processing Zones in Bangladesh: Economic Impact and Social Issues,* Working Paper No. 80. (Geneva International Labour Office).

৪১. Yang Whee Rhee (1990), "The Catalyst Model of Development: Lessons form Bangladesh's Success with Garment Exports", *World Development,* Vol.18, No 2, pp.333-346.

৪২. Munir Quddus and Salim Rashid (2000), *Enterpreneus and Economic Development: The Remarkable Story of Garment Exports from Bangladesh*, (Dhaka: The University Press, Dhaka).

৪৩. Bhattacharya *Export Processing Zones in Bangladesh*. আরো দ্রষ্টব্য, Naila Kabber and Simeen Mahmud (2004) "Globalization, Gender and Poverty: Bangladeshi Women Workers in Export and Local Markets', *Journal of International Development,* Vol.16, No.1. pp. 93-109.

৪৪. ILO (1998a) *Labour and Social Issues Relating to Export Processing Zones (*Geneva ILo).

৪৫. Dowla "Export Processing Zones in Bangladesh."

৪৬. æKorea May Import More from Bangladesh to Improve Balance" Interview of His Excellency Mr. Mustafa Kamal, the Honorable ambassador of Bangladesh to the Republic of Korea with *The Korea Post.* March 6, 2007.

৪৭. Helal Uddin Ahmed, æEPZs of Bangladesh" PL- 7

৪৮. প্রাগুক্ত

পঞ্চম অধ্যায়

Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং বাংলাদেশে এর অনুদান ভিত্তিক সাহায্য তৎপরতা, ১৯৯১-২০০৭

দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে মূলত দু'টি সংস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এ দু'টি সংস্থা হচ্ছে যথাক্রমে EDCF বা Economic Development Cooperation Fund এবং Korea International Cooperation Agency বা KOICA. KOICA-কে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে KOICA বাংলাদেশে বিভিন্নমূখী সহযোগিতার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, KOICA-এর সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। এর কারণ হলো বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক সম্ভাবনাময় এবং এসব খাতের এখনো পুরোপুরি আধুনিকীকায়ন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশকে এই অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে KOICA-র পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা যেমন, US AID, DANIDA, CIDA এবং JICA-র মত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করে চলেছে। KOICA-র এক বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে KOICA থেকে সহযোগিতা এসেছে সবচেয়ে বেশি, যার অবস্থান চীন ও ইন্দোনেশিয়ার পরেই। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে KOICA বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রদান করে থাকে। এর পেছনে অবশ্য বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থানও বিশেষভাবে দায়ী। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়া-বাংলাদেশ উপরোক্ত সহযোগিতার পেছনে আরো একটি কারণ বিশেষভাবে কাজ করেছে তা হল দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে জাপানের মত কোরীয় পণ্যের বাজার তৈরি করা। এ প্রসঙ্গে এশিয়ায় জাপানি ত্রাণ বিশেষজ্ঞ তরু ইয়ানাগিহারা (Toru Yanagihara) নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন যে,æ...... the whole South Asian region has taken an increased importance as a new frontier for Japanese ODA as the economies of East and South East-Asia make steady progress on the whole, with some of them ready to graduate from ODA, and as the waves of Asian Pacific dynamism begin to reach the shores of South Asian countries ”[১]

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক সহযোগিতার পেছনে কতিপয় মৌলিক অর্থনৈতিক কারণ দায়ী রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ উন্নয়শীল দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘনবসতিপূর্ণ। এ কারণে দেশটি দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা লাভ করে থাকে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যৌথভাবে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে এবং অর্থনেতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক অঙ্গণে দক্ষিণ কোরিয়ার বৃহৎ ও উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য কোরীয় সরকার উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে সাহায্য ও ঋণ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীলদেশের মত দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে বেছে নিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্যান্য দেশকে প্রদেয় সাহায্য কর্মসূচির অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া একটি বন্ধসুলভ উদ্যোগের দ্বারা নিজ সংস্কৃতিকে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নিকট তুলে ধরা ও এর অধিক উন্নতি ও বিকাশের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এভাবে দক্ষিণ কোরিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দক্ষিণ কোরিয়ার কৃতজ্ঞতাবন্ধনে আবদ্ধ করার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারণের দ্বারা। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়শীল ও নেতৃস্থানীয় দেশ হিসেবে এবং কোরীয় সহযোগিতা গ্রহণ করা ও কোরীয় সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টিতে বাংলাদেশ সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র এশিয়ায় কোরীয় æZone of Responsibility” তৈরির বা দায়িত্বশীল এলাকা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে মডেল বা নমুনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের দরিদ্র্যতা বিমোচনে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া মৈত্রী অর্থনৈতিক সহযোগিতার এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হিসেবে বিরাজমান।

এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন রাজ্যের সমান এবং প্রায় ১৫০মিলিয়নের বেশি জনসংখ্যা এখানে বসবাস করে। অবস্থানগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার গ্রীষ্মমন্ডলীয় আবহাওয়ায় অবস্থিত এবং এখানে বৈচিত্র্যপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে। অধিকন্তু দেশটি প্রায় দু'শো বছর বৃটিশ উপনিবেশের অধীনে থাকার ফলে এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হলে বাংলাদেশ এর ভগ্ন অর্থনীতি ও মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা ও সরকারের সাহায্য ও ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ড. রেহমান সোবহান তাঁর *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid*

to Bangladesh-শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, "Banladesh is heavily dependent on external assistance to cover its development requirements. Net ODA receipts of Bangladesh (in the 1980s) amount to roughly one-tenth of GDP, two-thirds of domestic investment, half of total central government expenditures and no less than nine-tenths of its development outlays." This aid dependence of Bangladesh has become a source of concern both to donors and to different segments of Bangladesh society".[২]

প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে অন্যান্য সহায়তাদাতা দেশ ও সংস্থাকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে সহযোগিতা করার আহবান জানানো হয়েছে। এগুলো হলো দারিদ্র্য বিমোচন, আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি, চিকিৎসা সেবা, কৃষি উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, প্রশাসন, যোগাযোগ এবং সেচ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতরূপ পরিগ্রহ করছে এবং এ দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আরো জোরদার হচ্ছে। এছাড়া কোরিয়া সরকার প্রদত্ত অর্থনৈতিক সাহায্য বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। সমসাময়িককালে বাংলাদেশের বাজারে কোরীয় পণ্যের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে যা দু'দেশের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে ভূমিকা পালন করে চলেছে। এভাবে KOICA-র মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এমন এক অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা দু'দেশের এই বাণিজ্যিক সম্পর্ককে চাঙ্গা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের দূর্বল অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে অবদান রেখেছে।

১৯৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশে KOICA-র সাহায্য কর্মসূচি চালু করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই সহযোগিতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সাহায্য কর্মসূচি, বাংলাদেশকে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী প্রদান এবং বাংলাদেশীদেরকে দক্ষ জনশক্তি রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করা। পরবর্তীতে অর্থাৎ ২০০০ সালের দিকে KOICA বাংলাদেশের দূর্বল অর্থনীতিকে আরো জোরালো করে তোলার লক্ষ্যে KOICA-র পক্ষ থেকে আরো কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একই সাথে সংস্থাটি বাংলাদেশের অধিক ফসল ফলাও কর্মসূচি, কৃষি উন্নয়ন, কৃষি ও হর্টিকালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করে। এছাড়া কৃষি উৎপাদন যন্ত্রপাতি, আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম এবং মেডিক্যাল যন্ত্রপাতিসহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। ১৯৯৫-

২০০৬ সালের মধ্যে প্রদত্ত KOICA-র মোট সাহায্য কর্মসূচির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০০৪০০০ মার্কিন ডলারের ওপরে। এসময়কালে বাংলাদেশে KOICA-র সাহায্য কর্মসূচির পরিমাণ অন্যান্য দেশ ও দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য কর্মসুচির তুলনায় সব চাইতে বেশি ছিল। বাংলাদেশে KOICA-র এই সাহায্য কর্মসূচিকে বিভিন্নভাবে শ্রেনীকরণ করা হয়। নীচে বিভিন্ন উপশিরোনামের আওতায় বাংলাদেশে KOICA-র সাহায্য কর্মসূচির বিভিন্নখাতের ওপর আলোকপাত করা হলো ঃ

বাংলাদেশে কোরিয়ার স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ

সমগ্র বিশ্বে KOICA-র সাহায্য কর্মসূচি যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত অথবা বাস্তবায়িত হয় তার মধ্যে Korea Overseas Volunteers (KOV) বা কোরিয়ার বিদেশী স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি অন্যতম। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘Peace Crops’ এর পরিবর্তিত সংস্করণ। সাধারণত বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতার ধরণ ও বিদেশে এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে KOICA-র স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করা হয়েছে। কোরিয়ার অভ্যন্তরে এবং বিদেশে KOICA-র সমস্ত ভ্রাম্যমান কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন সেক্টর ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে এই স্বেচ্ছাসেবীবাহিনীর তৎপরতা পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে KOICA-র সমস্ত কার্যক্রমকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচালনা করা ও এর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য এই বাহিনী উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা প্রথমে উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলোর প্রয়োজন চিহ্নিত করে এবং পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় চাহিদার রূপরেখা তৈরি করে। অতপর চূড়ান্তপর্বে উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং সরকারি নীতিনির্ধারকদের কাছে এসব চাহিদা ও প্রয়োজন উপস্থাপন করে। এক্ষেত্রে সাহায্য সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং এর সব স্তরের কর্মচারি ও কর্মকর্তাগণ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এসব উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী সমন্বিতভাবে সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে নিশ্চিত করে থাকে। এক কথায়, কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর দিকনির্দেশনায় ত্রাণ গ্রহণকারী দেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগের উদ্দেশ্য, গতিবিধি ও কার্যক্রমের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।

কোরীয় বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যগন তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞান, দক্ষতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব নির্ণয় করে পিছিয়ে পড়া এবং অবহেলিত অবকাঠামো

উন্নয়নে সহযোগিতামূলক সংস্থা এবং দেশগুলোর মধ্যে একটি স্থায়ী ও সুসম্পর্ক গড়ে তোলে। এসব স্বেচ্ছাসেবীদল ত্রান সাহায্য বাস্তবায়ন করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের সমস্ত উন্নয়ন ও ত্রাণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে KOICA-র সাবেক পরিচালক সাং তে-কিম লিখেছেন, æ…the KOVs as catalysts who serve as ongoing sustainable links and partnerships between organizations and communities on Korea and the world.”[৩] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি কোরীয় বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০৬ সালে কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বাংলাদেশে প্রায় ৪৮টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে। এ সম্পর্কে কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লীউন্নয়ন একাডেমীর (BARD) সহকারী পরিচালক জনাব খায়রুল কবির কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর আন্তর্জাতিক কার্যক্রম সংক্রান্ত এক সেমিনারে অংশগ্রহণ উপলক্ষ্যে ২০০৬ সালে সিউলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে KOICA-র কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, æ……contributing significantly to socio-economic activities and human resource development in Bangladesh by sharing there skills and experiences with the people. The aim of the activities of the KOVs is not only transferring technology and skills, but also building heart-to heart friendship with the grassroots.”[৪] এভাবে ১৯৯০ সালে æShare and Respect” লক্ষ্য অর্জনকে সামনে রেখে কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এর কার্যক্রম শুরু করে এবং কোরীয় তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে চলেছে। KOVs-এর এই কার্যক্রম KOICA-র অন্যান্য খাতে দেয় প্রযুক্তি কার্যক্রম থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী ধাচের। এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী বিভিন্ন উন্নয়নশীলদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে অংশগ্রহণের পাশাপাশি সেসব দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে সাং তে-কিম লিখেছেন, æ.......to the growth of friendship with developing countries, but also to benefit Volunteers themselves in the course of trying to overcome various hardship in their personal activities, and thereby contribute to the development of their international perspectives.”[৫]

প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক, কারিগরি ও অন্যান্য অভিজ্ঞতাকে প্রদান করা এবং একই ধারায় এসব দেশের কোন কোন উত্তম মূল্যবোধ ও বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করার মাধ্যমে পারস্পরিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে KOV বা কোরীয় বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এর কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অবশ্য একথা সত্য যে, অন্যান্য দেশের সাহায্য সংস্থার কার্যক্রমের ধারা বা নমুনা KOICA-কে এক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬০ সাল থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো শুরু করে। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের US Peace Corps এবং জাপানের Japan International Co-Operation Agency বা JICA-র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব বিদেশী সংস্থার সেবামূলক কার্যক্রম বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান হারে খাদ্যশস্য উৎপাদন, কৃষি বিপ্লব, প্রযুক্তি, কারিগরিজ্ঞানের উন্নয়নসহ গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এ প্রসঙ্গে সাং তে-কিম আরো লিখেছেন, æThese foreign volunteers have significantly contributed in the past to the production of increasing food grains, improvements in the agricultural implements and technologies and institutional development in the village community system.”[৬]

২০০৫-২০০৬ সালে Bangladesh Agricultural Rurul Development বা BARD-এর সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোরীয় অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য কোরীয় বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায়। পরবর্তীতে দুই দেশের সম্মিলিত এই অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে Community Volunteers Development Programe বা CVDP গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই কোরীয় প্রযুক্তি ‘সেমাউল দং আন্দোলন’ (Saemaul Dong Movement) নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে BARD-এর উপ-পরিচালক জনাব খায়রুল কবির বলেন, æ.....KOV team project on ‘Rural Community Development’ can enhance the CVDP components/activities in more effective way to face the emerging challenges in the area of rural institution development in the era of globalization.”[৭] বাংলাদেশে KOV-এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০০৫-২০০৬ সালের মধ্যে KOICA

কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের BARD-এর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর পক্ষ থেকে ৪ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। তারা ছিলেন যথাক্রমে, মি. কোং মিয়াং সুক (হর্টি কালচার ২ বছরের জন্য),মিস কিম জি ইয়ং (পুষ্টি ব্যবস্থাপনায় ১$\frac{১}{২}$বছরের জন্য), মিসেস চে ইয়োন মি (নার্সিং এ ১$\frac{১}{২}$বছরের জন্য) এবং মিসেস লী জে ইয়ং (পুষ্টি ব্যবস্থাপনায় ১ বছরের জন্য)। এভাবে KOICA কর্তৃক নিযুক্ত হবার পর কোরীয় বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর ৪জন প্রতিনিধি ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।[৮]

২০০৫-২০০৬ সালে কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবীরা KOICA-র পক্ষ থেকে বাংলাদেশে দু'টি বড় ধরনের বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর একটি হচ্ছে স্বাস্থ্যখাত, যা কুমিল্লা জেলার রাইচাও (Raichow) প্রাথমিক বিদ্যালয়ভিত্তিক ছিল। এখানে রাইচাও গ্রামের জনগনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। দ্বিতীয়টি ছিল কৃষি উন্নয়ন যা হাতিগাড়া গ্রাম ভিত্তিক কর্মসূচি। এ দু'টি প্রকল্প পরিচালনা করতে প্রায় ৩৩,০০০ মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। এছাড়া KOICA-র সহযোগিতায় দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞানদান ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আরও বড় ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ জন্য এখানে সুপরিসর স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন করা এবং পরিবেশবিদ্যা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা কক্ষ এবং পুষ্টি কার্যক্রম কক্ষ স্থাপন করা হয়। এসব কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য KOICA-র পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করা হয় এবং ছাত্রদেরকে রোগনির্ণয় পদ্ধতি শিক্ষা দানের জন্য পরীক্ষাগার ও গবেষণাগার স্থাপনসহ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়। অন্যদিকে কৃষি কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদেরকে বিভিন্ন কমিউনিটিতে একত্রিত করে তাদেরকে কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং যান্ত্রিক লাঙল বিতরণের মাধ্যমে অধিক খাদ্য ফলাও কর্মসূচিকে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া কৃষকদের যান্ত্রিক লাঙল মেরামত এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন খামার স্থাপন করা হয়। সর্বোপরি গ্রামবাসী ও কৃষকদেরকে ধান মাড়ায়ের যন্ত্র এবং চাউলের কল প্রদান করা হয়। এসব সাহায্য-সহযোগিতা এবং অবকাঠামো নির্মাণের ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে জনাব খায়রুল কবির লিখেছেন,

The improvement of environment of school, construction of a health care room and nutrition care room with necessary equipments and

instruments, health counselling and physical examination of students etc. have already given a very good environment for the students. On the other hand, agricultural extension work through power tillers and other technological devices contribute to the enhancement of income of the farmers community as well as contribute to the increased production. Even, at the suggestion and initiative of the KOVs, a warehouse was constructed where the co-operative society can keep there power tillers and other farm machineries safe and security. Above all, the KOVs has introduced the use of rice-cleaning mill which already wide demands amongst the farmers.[৯]

২০০৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজন KOVs বা কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পূর্ণগঠনের কাজে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ সালের ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে যে ৪৮জন কোরীয় বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্য তাদের বিভিন্নমূখী কার্যক্রম পরিচালনা করেন নীচে তাদের কর্ম প্রতিষ্ঠানের নাম ও দায়িত্বের তালিকা দেয়া হলোঃ

প্রতিষ্ঠানের নামঃ	**স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা**
যুব উন্নয়ন বিভাগ (DYD)	০৮ জন
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন সংস্থা (BADC)	০৩ জন
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (BARD)	০৪ জন
সাভার দুগ্ধ খামার	০১ জন
জাতীয় ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০১ জন
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০৬ জন
টঙ্গী হাসপাতাল	০১ জন
বাংলাদেশ-কোরিয়া ফ্রেন্ডসশীপ হাসপাতাল (BKFH)	০৬ জন
আধুনিক ভাষা শিক্ষা ইনষ্টিটিউট(DU)	০৩ জন
কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC)	১১ জন
প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BIMT)	০১ জন
বাংলাদেশ কোরিয়া উন্নয়ন সংস্থা (KDAB)	০২ জন[১০]

২০০৭ সাল থেকে কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্যগণ বাংলাদেশীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ কার্যক্রমের আওতায় ৩২জন স্বেচ্ছাসেবী সদস্যকে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য প্রেরণ করা হয় যার মধ্যে ২৪ জন সদস্য বাংলাদেশীদেরকে কোরীয় প্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশবিদ্যা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। নীচে এসব প্রশিক্ষণ প্রদানকারীদের তালিকা প্রদান করা হলোঃ

প্রকল্প	**স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর সদস্য সংখ্যা**
শিক্ষা	০৯জন
তথ্য ও প্রযুক্তি	০৪ জন
পরিবেশ বিদ্যা ও অন্যান্য	০৬ জন
স্বাস্থ্যখাত	০৩ জন
বিভিন্ন উন্নয়ন খাত	০১ জন
লোক প্রশাসন	০১ জন
মোট	২৪ জন[১১]

২০০৭ সালের মার্চ মাসে কোরীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আরো ৫৭টি মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার মধ্যে অধিকাংশই সামরিক প্রশিক্ষক এর মধ্যে একজন চিকিৎসক ও ২জন ম্যানেজার অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[১২]

বাংলাদেশে KOICA-র আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বাংলাদেশে KOICA-র সহযোগিতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান করা। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাংলাদেশে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে যা আবার বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে সাং তে-কিমের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, æKOICA would like to implement this unique Korean experience of industrialization by arranging training programs of the developing nations”[১৩] এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ গুলোর মধ্যে ছিল কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাংলাদেশীদেরকে বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দান করা, সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং বিবিধক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দান অন্যতম। একটি উন্নত দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও অভিজ্ঞতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

এজন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের সরকারি আমলা, নীতি নির্ধারক, গবেষক এবং উন্নয়নখাতের বিশেষজ্ঞ ও দিকনির্দেশকগণ কোরীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে স্বাগত জানায়। এ প্রসঙ্গে KOICA-র এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে, "In response to increasing demand from international community, KOICA offers a variety of programs which have been modified and diversified in their specialists and areas of expertise. Usually, the trainees are recruited in cooperation of the partner countries on the basis of certain official procedures."[১৪] এসব প্রশিক্ষণদান কর্মসূচিকে নীচে বিভিন্নখাত ভিত্তিক আলোচনা করা হলোঃ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য KOICA-র পক্ষ থেকে বনায়ন কর্মসূচি ও এর উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বনায়ন কর্মসূচি ও ফলমূল উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোরীয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করে একটি মজবুত উন্নয়ন ধারা গড়ে ওঠে। এ কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাং তে-কিম লিখেছেন, "This Program is aimed at transferring specialized technology and sharing Korea's development experiences in a wide range of fields, including government administration, education, agriculture, forestry, industry, energy, public health and medicine and social welfares among others."[১৫]

বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং অগ্রগতি অর্জনের জন্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কোরীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৬৩-১৯৭৬ সাল পর্যন্ত বার্ষিক কোরীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১২০টি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩১-এ উন্নীত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এশিয়ার দেশগুলোতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু ছিল এবং ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত এশিয়ার দেশগুলোতে এই প্রশিক্ষণ প্রদানের সংখ্যানুপাত ছিল ৮৮.৮%। তৃতীয়তঃ ১৯৮৯ সালের স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্তির পর থেকে এশিয়ার দেশগুলোতে এই প্রশিক্ষণের সংখ্যা ও পরিমান হ্রাস পেয়ে ৪৫.৫%-এ নেমে আসে। কিন্তু ১৯৯০সালে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বে পূর্ব ইউরোপের সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে দক্ষিণ

কোরিয়ার এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাং তে-কিম লিখেছেন, æ……as reflecting the Korea governments diplomatic consideration to keep better relations with countries in the regions other than Asia where South Korea already had maintainted a diplomatic predominance over North Korea."[১৬] বর্তমান সময়ে এশিয়ার দেশগুলোতে KOICA-র প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হ্রাস পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ অঞ্চলে দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ভাষায়, "It might be natural for the Korean government to give priority to the Asian region over other regions, given geographical proximity of the Asian region, social and cultural affinities with Korea, and more importantly, a similar level of industrial technology to that of Korea."[১৭]

তবে সাং তে-কিম এর মতে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হ্রাস পেলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোরিয়ার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত আছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০১ সালে KOICA-র পক্ষ থেকে ৪৮২ জন বাংলাদেশীকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য কোরিয়াতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আবার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের পাশাপাশি বাংলাদেশী কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে কারিগরি প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, শিক্ষানীতি এবং ব্যবস্থাপনা নীতি, কোরীয় ভাষা শিক্ষা, স্বাস্থ্য নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদ নীতি এবং প্রশাসন, আইন ও ফৌজদারী ব্যবস্থাপনা, সরকারি প্রশাসন, অর্থনীতি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা,পারমানবিক শক্তি উৎপাদন চুল্লি স্থাপন, কৃষি ও পানি সম্পদ, শিল্প ও কৃষি পণ্য রপ্তানি, খাদ্য শস্য উৎপাদন, কারিগরি গবেষণা ও এর উন্নয়ন, খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি-শিল্প, পরিবেশবিদ্যা গবেষণা, রেল যোগাযোগ, আঞ্চলিক বাণিজ্যিক চুক্তি, বেতার/টেলিভিশন ও প্রিন্ট মাধ্যম, পরিবার পরিকল্পনা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি যন্ত্রপাতি নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, মহিলা সমিতি গঠন, গ্রামীণ উন্নয়ন এবং সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[১৮]

২০০২ সালে শুরু হওয়া বাংলাদেশীদেরকে প্রদত্ত এ প্রশিক্ষণ দান কর্মসূচির হার নির্ধারণ করা হয় ৭০ জন এবং ২০০৩ সালে তা ৮৫ জনে উন্নীত হয়। কিন্তু ২০০৪ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে

দক্ষিণ কোরিয়াতে বাংলাদেশীদের প্রশিক্ষণের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস ও বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৬,৭২ এবং ৮২ জনের মধ্যে পৌছায়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে KOICA ৬৯৭ জন বাংলাদেশীকে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ সময়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে উচ্চ শিক্ষার (এম,এ ডিগ্রি) ডিগ্রি প্রদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র ও বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল।[১৯]

KOICA-র প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশে যেসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় ২০০৭ সালে সেক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময় বাংলাদেশের কর্মকর্তা, কর্মচারি, গবেষক ও কর্মীদেরকে ৪২ টি খাতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, লোক প্রশাসন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জাতীয় মান নির্ণয়, গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, চিকিৎসা নীতি, পরিবার পরিকল্পনা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, নারী অধিকার, পানি সম্পদ উন্নয়ন, বিবিধ উন্নয়ন এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বাণিজ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। এই ৪২জন বাংলাদেশীকে KOICA-র পক্ষ থেকে সাধারণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অন্যান্য দেশের নাগরিকদের সাথে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে ২০০৭ সালে শুধুমাত্র ১০জন বাংলাদেশী নাগরিককে তন্তু উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য, বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। অধিকন্তু বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, শুধুমাত্র বাংলাদেশীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এগুলো হলো, বড় ধরনের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডে দক্ষতা অর্জন, মাধ্যমিক পর্যায়ে কোরীয় ভাষা শিক্ষা দান করা, কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ, ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা, কোরীয় ভাষা শিক্ষার মানোন্নয়ন, কৃত্রিম উপগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য দান এবং নৌ পরিবেশবিদ্যা শিক্ষাদান প্রভৃতি। সাধারণত এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কোরিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কোরীয় ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউট স্কুল বা KAIST, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মন্ত্রণালয় এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, কোরিয়ান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক পলিসি বা KIEP প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে KOICA-র Country Program এ উল্লেখ করা হয় যে, “All these training programs are usally held in different Korean organizations such as the Korea Development Institute School or KAIST, different Universities, Ministries and Government institutes such as Korea Institute for International Economic policy or KIEP”.[২০]

সাধারণভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কোরিয়ার এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কতুটুকু অবদান রেখেছে? এর উত্তরে বলা যায় যে, এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে বিবিধ ক্ষেত্রে বহুমূখী উন্নতি সাধিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই প্রশিক্ষণের ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অপেক্ষাকৃত অনুন্নত খাতে, বিশেষ করে প্রশাসনিক খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে যা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে আধুনিক অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় KOICA-র প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কিন্তু পরবর্তীতে এই কর্মসূচির পরিধি পরিবর্ধন করে এর সাথে পেশাগত দক্ষতা প্রশিক্ষণকে যুক্ত করা হয় যার মধ্যে কোরিয়ার শক্তিশালী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্বদানের অভিজ্ঞতাকে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে KOICA-র এক প্রতিবেদনে প্রশিক্ষণ দান ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, æProvide participants with the opportunuty to acquire professional knowledge including studing the Republic of Korea's economic development and leadership experience.'' [২১]

সাধারণভাবে এসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের ফলে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী দেশসমূহ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে ভাষাগত, সাংস্কৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বহুলাংশে বাস্তবায়িত হয়েছে। কারিগরি বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসকেরা এবং আমলাগণ বেসরকারি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পল্লী উন্নয়ন, পরিবেশ বিপর্যয় রোধ, কৃষি-শিল্প উন্নয়ন, অপরাধ দমন ও এতদ্‌সংক্রান্ত প্রশাসনব্যবস্থাসহ বিবিধক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এসবদিক বিবেচনাপূর্বক স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার নিকট থেকে কারিগরি, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তা বাংলাদেশকে খুব দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে সহায়তা করবে এবং এর মাধ্যমে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত MDGs (Millenium Development Goals) এর বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অধিকন্তু এই প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা গ্রহণ বাংলাদেশী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদেরকে বাংলাদেশ প্রশাসনের দূর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে এবং তা প্রতিরোধ করে ঐসব খাতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। এভাবে এসব প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ অধিক

জনসংখ্যাজনিত সমস্যা এবং ঝুকিপূর্ণ আবহাওয়া মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক উন্নতির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্বের মডেল হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাড়াবে। এছাড়াও আকস্মিক বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠতেও এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বাংলাদেশকে সহায়তা করবে। বিশেষ করে, এই প্রশিক্ষণ বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং তা গ্রামীণ অর্থনীতিক ভিত্তিক দেশ হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণ লাভকারী বাংলাদেশীদের কোরীয় প্রশিক্ষণ এবং এতদ্সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা তাদেরকে গ্রামীণ অর্থনীতির দূর্বল খাত ও সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়েছে যেমনটি কোরীয়রা তাদের গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে æSaemaul Undong” অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল। এ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বাংলাদেশীদেরকে কৃষি ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা দান করবে যার ওপর ভিত্তি করে কৃষি ক্ষেত্রের তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত গবেষণা করতে এবং এর দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে ও তা প্রতিরোধ করতে সহায়তা করবে। [২২]

বাংলাদেশ KOICA–র বেসরকারি সহায়তা কর্মসূচি

এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে KOICA এর উন্নয়নের কর্মকান্ডকে পরিবর্তন করে একটি বেসরকারি নীতি গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে ১৯৯৫ সাল থেকে KOICA বিভিন্ন কোরীয় NGO-র মাধ্যমে এর উন্নয়নমূলক কার্যাবলী পরিচালনা করে। এছাড়া স্বাগতিক দেশগুলোতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিচালনার মাধ্যমে KOICA-র কর্মপরিধি আরো বৃদ্ধি লাভ করবে। KOICA-র এই বর্দ্ধিত ভূমিকা সম্পর্কে ১৯৯৫ সালে KOICA-র প্রতিবেদনে বলা হয় যে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, æenhance delivery and promote community engagement on development issues.” [২৩] এ ছাড়া KOICA-র নিজস্ব প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয় যে, যদি NGO-র মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহায়তা কর্মসূচি চালু করা হয় তাহলে দেশের বাইরে KOICA-র উন্নয়ন কার্যাবলী খুব দ্রুত প্রসার লাভ করবে। পরবর্তীতে কোরীয় NGO-র মাধ্যমে কোরীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেমন সফলতা লাভ করবে তার প্রতিবেদন তৈরির জন্য সিউলে অবস্থিত KOICA-র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা কিম চে হিউংকে (Kim Chae Hyoung) দায়িত্ব প্রদান করা হয়। হিউং তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, NGO-র মাধ্যমে KOICA-র অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হলে সারা বিশ্বে তা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করবে

এবং কোরীয় অভিজ্ঞতাকে খুব সহজেই বিভিন্ন দেশের মানুষ কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। হিউং এর এই প্রতিবেদন অনেক বির্তকের পর KOICA-র আলোচনা সভায় গ্রহণ করা হয় এবং এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, KOICA-র উন্নয়ন তরান্বিত করার জন্য একটি কর্মসূচি তৈরির মাধ্যমে NGO-র দ্বারা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। এ প্রসঙ্গে KOICA-র মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের শিক্ষা প্রশিক্ষণ টিমের এক সাক্ষাৎকারে ইয়োন কিয়ূম বলেন, æThis report of Hyoung after much debate, got acceptance and based upon his recommendation, KOICA began to provide subsidies and consultations to Korean NGOs which are engaged in Socio-Economic development projects in the developing countries.”[২৪]

এই প্রতিবেদন তৈরি ও গ্রহণের পর পরই ১৯৯৪ সালে সাধারণভাবে কোরীয় NGO-র কার্যাবলীর সাথে সমন্বয় রেখে KOICA-র কর্মতৎপরতার স্বার্থে কোরীয় NGO শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়[২৫]। ফলে ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে ৪২টি NGO উন্নয়নশীল দেশে কাজ করার জন্য KOICA-র সাথে নিবন্ধন করে[২৬]। এরপর থেকে NGO-র সমর্থন লাভের জন্য KOICA মানুষের মৌলিক চাহিদা সম্বন্ধে ধারণা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এর নিজস্ব NGO বিষয়ক কর্মসূচি শুরু করে। এভাবে বিভিন্নক্ষেত্রে সরকারিভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ দান করা হয় যাতে মানুষের মৌলিক চাহিদা সহজেই অনুধাবন করা যায় এবং যা তৃণমূল পর্যায়ে তাদের চাহিদাপূরণ সম্ভবপর করে তুলবে। এই ধারণা থেকে Korea Council for Overseas Cooperation (KCOC) এর সাথে KOICA-র কার্যক্রম সমন্বয় করে যা কোরিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নে NGO গুলোর ছাতাসংস্থা বা Umbrella Organization হিসেবে কাজ করে। এভাবে ২০০১ সাল থেকে KCOC-এর সাথে NGO সমন্বয় করে যার ফলে KCOC-র দক্ষ প্রশাসনের দ্বারা KOICA এর NGO-র কার্যাবলী ও এই উদ্দেশ্য আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করে তুলতে সক্ষম হয়। KOICA-র সাথে NGO গুলোর কর্মকান্ডের সমন্বয়ের কারণ হিসেবে ইউন বলেন যে, শুধুমাত্র KOICA-র পক্ষে সাহায্য গ্রহণকারী দেশ সমূহের সমস্যা ও চাহিদা তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত উদঘাটন ও তার সমাধান করা সম্ভব নয় এবং এ কারণেই প্রয়োজন NGO-র সহায়তা। এ উদ্দেশ্যে তিনি মন্তব্য করেন যে, æThe NGOs activities focus on the grass roots, emphasizing refugees, children and Basic Human needs poverty, disaster and the least

develped areas are the main targets of NGO activities. There projects are health, medical services, educational, nutrition, family planning, housing increasing income and refuse relief for Korea it is humanitarian activity to support these NGOs.”[২৭]

NGO প্রতিষ্ঠার সময় KOICA যেসব NGO-র সাথে চুক্তি করেছিল সেগুলো ছাড়াও এর NGO কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী এবং অর্থনেতিক কার্যক্রমের খাত আরো বৃদ্ধি করার জন্য KOICA আরো কতিপয় নতুন NGO-র সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে থাকে। ১৯৯৫ সালে KOICA যখন বেসরকারি সংস্থা কার্যক্রম চালু করে তখন এর অর্থনৈতিক তহবিল অনেক ছোট ছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালে ২৪টি প্রকল্পের আওতায় ২২টি কোরীয় NGO প্রায় ৭৪০০০ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে।[২৮] বর্তমানে KOICA-র ৪০টির অধিক NGO বিদেশে তাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনায় অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। KOICA-র পক্ষে যেসব NGO বিদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, CARITAS, KDAB (Korea Development Association in Bangladesh), Good Neighbors International, Habitat for Humanity, World Vision, Global Care, Plan International, Future for African Children (FAC)প্রভৃতি[২৯]।

ঢাকাস্থ কোরীয় দূতাবাসে অবস্থিত KOICA চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের NGO গুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। ১৯৯৫ সালে KOICA-র পক্ষ থেকে কোরিয়ার আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকাতে প্রথম Asian Red Cross Volunteers Committees এর সম্মেলনের আয়োজন করে। বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কোরিয়ার তিনটি NGO প্রাথমিক পর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান করে। এগুলো হলো, The KDAB, The Good Neighbor International এবং The World Vision. ১৯৯৬ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এই তিনটি NGO বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১২টি প্রকল্পের কর্মসূচি পরিচালনা করে। The Korea Development Association in Bangladesh ২০০২ সালে æChilmari-Ulipur Community Health Care Project” নামক কর্মসূচি শুরু করে যা ২০০৮ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। একইভাবে KDAB ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে এর কার্যক্রম শুরু করে যা ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়, æto improve the

health condition of the local people.” এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল একেকটি গ্রুপে ১২,০০০ স্থানীয় জনগনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়ঃ

১) স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি নিশ্চিত করা;

২) ভ্রাম্যমান চিকিৎসা সেবা দান করা;

৩) দেশের অভ্যন্তরে মানুষকে ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা;

৪) নিয়মিতভাবে মাদকতাবিরোধী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা;

৫) গণস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশণ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান ও সম্প্রসারন করা;

৬) পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৭) নিয়মিত নারীস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা;

৮) কুষ্ঠ রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা দান করা;

৯) দরিদ্র পরিবারের যুবকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং

১০) সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান কর্মসূচি চালু করা[৩০]।

KDAB ছাড়াও বাংলাদেশের শিক্ষা ও উন্নয়নখাতের জন্য কাজ করছে The Good Neighbor International নামক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা যা KDAB এর অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। একটি আন্তর্জাতিক NGO The Good Neighbors International OECD বা Organization of Econimoc Co-opreration and Development এবং DAC বা Development Assistant Committe-এর নীতিমালার সাথে সমন্বয় পূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে যা ২০০২ সালের মধ্যে এর লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে। অবশ্য ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে Good Neighbors International-এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ঘোষণা করা হয়। এগুলো হলো (১) দরিদ্র কৃষকদের আয় বৃদ্ধি; (২) স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি; এবং (৩) স্বকর্মসংস্থান গড়ে তোলা। এই NGO টির কর্মকান্ডের জন্য তার কার্যের জন্য সিরাজগঞ্জ,সাভার এবং ঘাটাইলকে বেছে নেয়। বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে NGO টি নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ঃ

ক) কৃষি উন্নয়নের জন্য কৃষকদেরকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা;

খ) কৃষক এবং গ্রাম্য মাতববর শ্রেণীর নেতাদেরকে কৃষি উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

গ) আদর্শ খামার স্থাপনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

ঘ) নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞান দান করা;

ঙ) নেতৃত্ব প্রদানের দক্ষতা ও মানসিকতা তৈরি;

চ) স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরা; এবং

ছ) স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর কর্মস্থলের বন্টনে উৎসাহিত করা।

এসব NGO কঠোর পরিশ্রম এবং নিবিড়পরিচর্যার মাধ্যমে পরিচালিত কার্যাবলীর মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে অগ্রগতি অর্জন করেছে। বিশেষ করে, KDAB-র কার্যক্রমের ফলে চিলমারি-উলিপুর প্রকল্প এলাকায় মৃত্যুহার প্রতি ৩০০০ জনে ৪০জন থেকে হ্রাস পেয়ে ৩০০০ জনে ১ জনে এসে দাড়িয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার হার প্রতিবছর ২০০ জনে উন্নীত হয়েছে[৩১]। এদিকে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে Good Neighbors International প্রকল্পের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মহিলাদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতেও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে[৩২]।

বাংলাদেশে KOICA-র অর্থায়নে পরিচালিত কোরিয়ার তৃতীয় NGO প্রকল্প বগুড়াতে অবস্থিত। এটি æRural Development Project for Bogra''নামে পরিচিত। এ NGO-র নাম হলো World Vision। এটিও একটি আন্তর্জাতিক NGO যা KOICA-র প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশে কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে। এই NGO টি বগুড়া এলাকার গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এলাকার উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। এই প্রকল্পে KOICA-র প্রায় ৭৪,৭০০০ মার্কিন ডলার ব্যয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে।[৩৩]

বাংলাদেশে KOICA-র সহযোগিতামূলক প্রকল্প

সহযোগিতামূলক প্রকল্প বলতে সাধারণত ত্রাণ কার্যক্রমকে বোঝানো হয়ে থাকে যা সাধারণত উভয় দেশের সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রম শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে ত্রাণ গ্রহণকারী দেশের আবেদনের ভিত্তিতে স্বাগতিকদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং স্থানীয় জনশক্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। তবে দক্ষিণ কোরিয়া KOICA-র মাধ্যমে আরো অনেক বেশি প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে থাকে। এসব সহায়তামূলক প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসাসেবা, কৃষি, মৎস্য

উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জনপ্রশাসন প্রভৃতি। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে KOICA-র সহযোগিতামূলক প্রকল্পের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এ যাবতকাল KOICA ৩১টি দেশে মোট ৫৭টি সহায়তামূলক প্রকল্প চালু করেছে। এসব প্রকল্পে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ১১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যার ৮৭% ব্যয় করা হবে উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক উন্নয়ন এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্কুল এবং হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি খাতে। এছাড়া ২৯টি দেশের ৪৬টি প্রকল্পের ৫% ও ৮% হারে উন্নয়নশীল দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পায়ন কাজে ব্যয় করা হবে। সর্বোপরি এশিয়া ও ওশেনিয়া মহাদেশের ১৩টি দেশের ৩৮টি সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য মোট অর্থের প্রায় ৬৯.৫% ব্যয় করা হয়।[৩৪]

সাধারণত তিনটি খাতে KOICA-র পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে সহায়তামূলক প্রকল্পের আওতায় সাহায্য দান করা হয়। এগুলো হলোঃ

i) Facilities: এই প্রকল্পের আওতায় KOICA-র পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে কেবলমাত্র ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সহায়তা দান করা হয়।

ii) Role-Sharing Support: এই প্রকল্পের অধীনে KOICA-র পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্থাপত্য নির্মাণ, মেরামত, কারিগরি উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নসহ এবং এ সমস্ত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়।

iii) Comprehensive Support: এই প্রকল্প KOICA বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পখাত, বিশেষ করে ধাতব শিল্পের বিকাশে সহায়তা দান করে থাকে।[৩৫]

উপরোক্ত প্রকল্পের সবক'টি KOICA-র নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। অবশ্য KOICA-র এসব সহায়তাদান কর্মসূচি উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবকাঠামো পরিবর্তন করে সহযোগী দেশগুলোকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নয়নমূলক কাজে সহায়তা করার আহবান জানায়। তবে বেশ কতিপয় ক্ষেত্রে কোরীয় বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এ বিশেষ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা, জনপ্রশাসন, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ এবং গণযোগাযোগ বিভাগ উল্লেখযোগ্য। এসব কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে সময়ের ব্যবধানে KOICA-র কার্যপরিধি একদিকে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিক তেমনিভাবে প্রকল্পসমূহ আরো শক্তিশালী হয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

কোরীয় সহায়তামূলক প্রকল্প থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সহায়তা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে KOICA-র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাইয়্যুন-সিক (Dr.

Hyun-Sik) লিখেছেন, æIts (ptoject type) include construction of hospitals and other infrastructure. In addition to the construction program, we provide all sorts of medical equipments and goods, dispatched doctors and nurses and other necessities for the hospitals. These programs are known as comprehensive package programs”[৩৬] বাংলাদেশে কোরীয় সহায়তামূলক প্রকল্পসমূহের বর্ণনা নীচে দেয়া হলোঃ

প্রথম প্রকল্প, বাংলাদেশ-কোরিয়ান ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল সাভার

এই প্রকল্পের মেয়াদ ১৯৯৪-১৯৯৬ সাল এবং প্রকল্পের ব্যয়িত সম্পদের পরিমান ১,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। স্থানঃ টেনটুরি মৌজা (বিকেএসপির পাশে)। এ সহায়তামূলক প্রকল্পের আওতায় KOICA সাভারে একটি হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। এখানে শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং টিকাদান কর্মসূচি চালু করা হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য KOICA বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তি করে এবং ৫৩৩ মিটার জমি ক্রয় করে এবং তাতে একটি দ্বিতল ভবন নির্মাণ করে। এটি ৩০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আকুপাংচার হাসপাতাল। এছাড়া এই সহায়তামূলক প্রকল্পের অর্থ যানবাহন, থেরাপি মেশিন, ঔষধক্রয়-বিক্রয়সহ হাসপাতালের স্টাফদের জন্য ডরমেটরি বিল্ডিং তৈরিতে ব্যয় করা হয়। এছাড়া সাভার এলাকার চিকিৎসা সেবাকে আরও বৃহৎ পরিসরে প্রদান করা এবং জরুরী ও বর্হিবিভাগে রোগী দেখার জন্য এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়।[৩৭]

দ্বিতীয় প্রকল্প, মেয়াদ-১৯৯৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরীয় ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র চালু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ১০০০০০ মার্কিন ডলার ব্যয় সাপেক্ষে কোরীয় ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। প্রকল্পের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, একটি নিয়মিত বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং গবেষণাগার স্থাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি কোরীয় ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। অধিকন্তু কোরীয় ভাষা শিক্ষা প্রদানের জন্য কোরীয় ল্যাবরেটরিতে ৩০টি আসন রয়েছে যেখানে কোরীয় ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর এবং KOICA ৩০টি আসনে নিয়মিতভাবে কোরীয় ভাষা শিক্ষা দানের জন্য কোরীয় ভাষা গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে। ৩০ দিন করে ১জন কোরীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ কোরীয় ভাষা শিক্ষাদান এবং তা পরিচালনা করেন। এছাড়া ২জন কোরীয় প্রকৌশলী ১ সপ্তাহের জন্য প্রকৌশল শিক্ষা এবং ১জন কোরীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফদের দীর্ঘ সময়ের জন্য কোরীয় ভাষা শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। এছাড়াও ২জন ছাত্রকে ১০ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কোরিয়াতে পাঠানো হয়।[৩৮]

তৃতীয় প্রকল্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্যবিদ্যা ও কারিগরি শিক্ষা প্রকল্প, ২০০১-২০০৩

এপ্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় করা হয় প্রায় ৬,৯০,০০০ মার্কিন ডলার। এ সহযোগিতামূলক প্রকল্পটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের অধীনে পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পে KOICA ১২০ জন ছাত্রকে তথ্য প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করে থাকে এবং ১২জন বিশেষজ্ঞকে ২সপ্তাহের জন্য KOICA-র তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়।[৩৯]

চতুর্থ প্রকল্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র প্রকল্প, ২০০৩-২০০৪

এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় করা হয় প্রায় ১,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় ætto establish the information technology system of the Center for Advanced Research and Development in Science and Technology at the University of Dhaka" এবং 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনশক্তিকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা'। এই প্রকল্পের আওতায় KOICA কোরিয়া সরকারকে বাংলাদেশের তথ্য-প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি সাধনে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ক সরঞ্জামসহ ২জন কোরীয় তথ্য প্রকৌশলীকে বাংলাদেশে প্রেরণের আহবান জানায় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী বাংলাদেশীদেরকে কোরিয়াতে আমন্ত্রণের আহবান জানায়।[৪০]

পঞ্চম প্রকল্প, বাংলাদেশে কোরীয় কারিগরি প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রকল্প (ঢাকা শহর) ২০০৩-২০০৪

এ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ করা হয় ১,৪০০,৬৬৩ মার্কিন ডলার। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, (ক) কোরীয় পদ্ধতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দ্বারা কোরীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানব সম্পদকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলা; (খ) কোরীয় প্রশিক্ষকদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে কোরীয় তথ্য প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান দানের মাধ্যমে বাংলাদেশীদেরকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলা; এবং (গ) দুই দেশের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তি

প্রবাহের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রকল্পকে সফল করা। এটি একমাত্র প্রকল্প যা ঢাকায় অবস্থিত Bangladesh Burreau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মেয়াদ সম্প্রসারণ এবং চুক্তি নবায়ন করার অধিকার লাভ করে। কেবলমাত্র চুক্তি নবায়ন ছাড়া KOICA এই প্রকল্পের সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে এবং কোরীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রকল্পের কার্যাবলী পর্যাবেক্ষণ করার অধিকার লাভ করে। এছাড়া বাংলাদেশী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোরীয় প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণ জানানোসহ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে।[৪১]

ষষ্ঠ প্রকল্প, বাংলাদেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (ঢাকা শহর) ২০০৭-২০০৯

এ প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪২২,০০০ মার্কিন ডলার। এ প্রকল্পে KOICA ঢাকা শহরের পুরাতন ভবন ভেঙ্গে সেগুলো মেরামত এবং প্রয়োজনবোধে আধুনিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। এই মেরামত কাজটি KOICA বাংলাদেশ ব্যুরোর জনশক্তি ব্যবহার নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যুরোর সহায়তাও এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এই মেরামত কার্যক্রমকে সফল করার জন্য KOICA প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সেখানে কোরীয় পর্যবেক্ষক এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রেরণ,এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম প্রদানসহ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এছাড়া KOICA-র নিজ খরচে চলমান প্রকল্পকে সফল করার জন্য বাংলাদেশী দিকনির্দেশক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সর্বোপরি উন্নয়ন সংক্রান্ত বই-পুস্তক সরবরাহসহ সমস্ত প্রকল্পকে সফল করার জন্য সমস্ত ব্যয়ভার KOICA বহন করে থাকে।[৪২]

সপ্তম প্রকল্প, বাংলাদেশ-কোরিয়া তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

প্রকল্পের মেয়াদঃ ২০০৩-২০০৪ঃ ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১,০০০,০০০ মার্কিন ডলার। প্রকল্পের স্থানঃ শেরে বাংলা নগর, ঢাকা। এ প্রকল্পে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের ঘোষণা প্রদান করা হয়ঃ

১) একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের মানব সম্পদকে তথ্য প্রযুক্তিখাতে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন;

২) তথ্য প্রযুক্তিখাতে ডিপ্লোমা ট্রেনিং কোর্স এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং কোর্স প্রদান;

৩) তথ্য প্রযুক্তিখাতে আরো দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের পেশাদারী সার্টিফিকেট কোর্স চালু; এবং

৪) উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারি ও কর্মকর্তাদেরকে সরকারি চাকুরির উপযোগী করে গড়ে তোলা। এ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ মানব সম্পদকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তুলতে পারলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনশক্তির চাহিদা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। এজন্য BKIICT ঢাকা শহরের শেরে বাংলা নগরে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ভবন (BCC) নির্মাণ করেছে এবং এখান থেকে ICT সেক্টরের প্রশিক্ষণ কার্যাবলী পরিচালনা করে থাকে। এখানে ২০টি আসনের মধ্যে ৬টি প্রশিক্ষণ গবেষণাগার রয়েছে যার মধ্যে আছে শতভাগ নেটওয়ার্ক ও শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেনটেশন সিস্টেম এবং অডিও এ্যাড্রেসিং সিস্টেম। এসব প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তিনজন দক্ষ কোরীয় প্রশিক্ষক এবং ৩জন কোরীয় বৈদেশিক স্বেচ্ছাসেবী প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।[৪৩]

বাংলাদেশে জরুরী ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় KOICA-র ত্রাণসহায়তা ও পর্যবেক্ষক প্রদান

KOICA উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জরুরী মানবিক কার্যক্রম চালাবার জন্য বিভিন্ন ধরণের উপকরণ ও ধাতব সামগ্রী, যেমন, যানবাহন, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সরঞ্জাম কেবলমাত্র মানবিক কারণে এবং কোন প্রকার বিনিময় মূল্য ছাড়াই প্রদান করে থাকে। এই প্রকল্পটি সাধারণত জরুরী ভিত্তিতে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে এবং যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দেশকে প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত দু'টি দেশের মধ্যে যুদ্ধকালীন সময়ে, একটি দেশের মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন-বন্যা, ভূমিকম্প, খরা, ঘুর্নিঝড়, প্রভৃতি খাতকে এক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং বলা হয় যে, এসব দেশের জনগন সব সময় তাদের বাড়ি ঘর নিয়ে ঝুঁকির মধ্যে কাল যাপন করে। এ পরিস্থিতিতে KOICA এসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য জরুরী ত্রাণ সহায়তা এবং দীর্ঘ মেয়াদী পূর্নবাসণ সহায়তা প্রদান করে। সাম্প্রতিককালে জাতিসংঘের আহবানে সাড়া দিয়ে KOICA ইরাকে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আফগানিস্তানে ২০০২-২০০৪ সময়কালে ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে। এক্ষেত্রে KOICA এসব যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের জন্য এ মনোভাব প্রমান করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছে যে, কোরীয় বিশেষজ্ঞরা এসব দূর্দশাগ্রস্ত মানুষদের সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান দিতে পারে। ইরাকে এবং আফগানিস্তানে KOICA যেসব ক্ষেত্রে মানবিক ও ত্রান সাহায্য প্রদান করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মানব সম্পদ

উন্নয়ন, সরকার নিয়ন্ত্রিত ভবন নির্মাণ ও মেরামত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা এবং বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন।[৪৪]

KOICA-র অপর সহায়তামূলক কর্মসূচি হলো প্রাকৃতিক দূর্যোগে নিপতিত এবং বিভিন্নভাবে দূর্দশাগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করা। সাধারণত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে ক্ষতি হয় এবং কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নয়নের যে ঘাটতি দেখা দেয় সে সব ক্ষেত্রে KOICAএই সহায়তামূলক কর্মসূচি প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে সুনামী এবং ২০০৫ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করা যায়। এ ধরণের পরিস্থিতিতে KOICA খুব দ্রুত এসব এলাকায় জরুরী ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম এবং স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচি চালু করেছে।

সাধারণত যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশে KOICA-র পক্ষ থেকে দ্রুত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় ও বাস্তবসম্মত পুর্নবাসন, ত্রান ও পুর্নগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশের সাথে নিয়মিত কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো হয়। এই কূটনৈতিক তৎপরতা সাহায্য গ্রহীতা দেশ ও কোরিয়া সরকারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তবে এসব সহায়তা সামগ্রী ও কার্যক্রম সাহায্য গ্রহণকারী দেশ, সরকারি সংস্থা অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে সহায়তা গ্রহণকারী দেশ তাদের সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন যানবাহন, কম্পিউটার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা হয়। এসব যানবাহন এবং যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি সাধারণত কোরিয়াতে তৈরি করা হয়। এ প্রসঙ্গে সুক কিয়্যুন ইয়ূন (Suk Kyoon Yoon) তাঁর *Trade, Diplomacy, and Humanitarinism* গ্রন্থে লিখেছেন, æOne way to give recipient countries a good image of Korean products. Most Koreans agree and like this point. The brand names of the vehicles are Korean Auto Manufactures like Hyundai, Ssangyong. And the names are Sonat, Elantra, Muso, and Corus.”[৪৫] এ নীতির ভিত্তিতে KOICA বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং ১৯৯৫ থেকে ২০০৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য সহায়তাসহ প্রায় ১,০১৯০০০/০০ মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদান করে থাকে। এসব পণ্য দ্রব্যের তালিকায় রয়েছে শিক্ষা সংক্রান্ত দ্রব্যাদি, চিকিৎসা ও কারিগরি পণ্য, কপি মেশিন, ডেন্টাল সরঞ্জাম, প্রিন্টার টোনার মেশিন, স্ক্যানার, টেলিভিশন সেট, অটোমোবাইল, শীতাতপ যন্ত্র, ফ্যাক্স মেশিন, এ্যাম্বুলেন্স, ঔষধ, কম্পিউটারের প্রিন্টার, অফিসে ব্যবহারের জন্য

গাড়ি, অটোমোবাইলের যন্ত্রপাতি, রোগ নির্ণয় মেশিন, Chemical Analyzer, পানির ট্যাঙ্ক, Inter phone cables, মুঠোফোন, Suction Motor-1, ইউপিএস প্রভৃতি। এ সমস্ত যন্ত্রপাতির অধিকাংশ এবং যানবাহন ও কম্পিউটার সবই কোরিয়াতে নির্মিত।[৪৬] মি. ইউন তাঁর পর্যাবেক্ষণে এসব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে দু'টি ধারণা দান করেছেন। প্রথমত, এ সমস্ত দ্রব্যাদি প্রেরণের ফলে এর যন্ত্রাংশের সাথে একটি কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হবে, এবং দ্বিতীয়ত, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এসব দ্রব্য প্রেরণের মাধ্যমে অনুন্নত দেশে কোরীয় পণ্যের একটি বাজার তৈরি করতে সক্ষম হবে। [৪৭]

এ সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রেরণ ছাড়াও KOICA বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন-বিরূপ আবহাওয়া, বন্যা, সাইক্লোন, প্রভৃতি খাতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ১৯৯২, ১৯৯৪ এবং ২০০৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে প্রায় ১৮৯,০০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ পণ্য দ্রবাদি দিয়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ঐসব পণ্যের মধ্যে কলেরা নিরাময় বিষয়ক পণ্য, আটা, চিনি, কৌটাজাত মাছ, শিশু খাদ্য, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অন্যতম।[৪৮] এছাড়া বন্যা ও অনান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর কলেরা, ডায়রিয়া প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের জন্য KOICA বাংলাদেশে বিভিন্নমূখী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। অপরদিকে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যাদি প্রদান করা ছাড়াও বাংলাদেশ KOICA-র কাছ থেকে এসব দূর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশের কর্মকর্তাদেরকে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হয়।

বাংলাদেশে KOICA-র উন্নয়নমূলক পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশকে একটি দ্রুত এবং অগ্রগামী অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে তুলে ধরার জন্য KOICA বাংলাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প পর্যাবেক্ষণ করে। এসব প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে æhelps developing countries conducts basic surveys and develop designs and plans for a variety of project." প্রকল্প সমূহের আওতায় KOICA কোরিয়ার কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে বাস্তব সম্মত এবং কিভাবে বাংলাদেশকে আরও দ্রুত উন্নতি সাধন করা যায় সে সম্বন্ধে একটি ধারণা দান করে।[৪৯]এ পর্যবেক্ষণ তালিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ, বিমান বন্দর স্থাপন, পোতাশ্রয় নির্মাণ, কৃষি, মৎস্য, বনজ, সৌর শক্তি, পানি সম্পদ, পল্লী ও নগর উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি। একই প্রকার উন্নয়ন ও পদ্ধতি KOICA ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও চীনের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করে। তবে KOICA বাংলাদেশে দুটি প্রকল্প

বাস্তবায়নের ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দেয়। এর প্রথমটি হলো ঢাকার সাভারে অবস্থিত বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং দ্বিতীয়টি বৃহৎ শহর চট্টগ্রামের পানি ও পয়নিষ্কাশণ ব্যবস্থাপনার মহাপরিকল্পনা তৈরি। এই দুটি পরিকল্পনা হচ্ছে KOICA-র ২০০৭ সালের পর্যাবেক্ষণ পরিকল্পনার ফসল। প্রথম প্রকল্পটি লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য ভবন বাস্তব সম্মত হয়েছে কিনা KOICA তা পর্যাক্ষেণ করেছে। এরপর KOICA-র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীদের এবং কোরিয়া ও বাংলাদেশের চাকুরিজীবিদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম প্রশিক্ষণদানের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। এরপর বাংলাদেশের সরকারি কার্যক্রম প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোরিয়া উচ্চ পর্যায়ের কতিপয় প্রশিক্ষককে Bangladesh Civil Service Adminitration Academy (BCSAA)-তে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আয়োজন করে। এছাড়া কোরীয় বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশ লোক প্রশাসন চাকুরীজীবিদেরকে অধিকতর উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিভিন্ন কারিকুলাম বা পাঠ্যক্রম প্রদান করে। KOICA-র নিজস্ব ব্যয়ে এসব চাকুরীজীবির জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন উপাদান সরবরাহ করে।[৫০] বাংলাদেশে KOICA-র দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণমূলক প্রকল্প হল বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংক কেন্দ্রিক প্রকল্প স্থাপন করা যা ২০০৭-২০০৮ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। বিশ্ব ব্যাংক রেফারেন্স হিসেবে যে সব শর্তারোপ করেছে এবং প্রতিবেদন পেশ করেছে তাতে KOICA-কে সমস্ত প্রকল্পটির একটি মহাপরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই মহাপরিকল্পনাটি হচ্ছে বাংলাদেশের মেগাসিটি চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহ এবং জলাবদ্ধতা নিরসন করা। KOICA অবশ্য চট্টগ্রামে কোরীয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শক্রমে চট্টগ্রামে পানি সরবরাহ ও জলাবদ্ধতা নিরসনের ওপর একটি পূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এছাড়া KOICA কিছু IT সরঞ্জাম ক্রয় এবং বাংলাদেশীদেরকে কোরিয়াতে এ বিষয়ে উচ্চ প্রশিক্ষণ প্রদানের কথাও ঘোষণা করে। পরিশেষে KOICA-র নিজ খরচে এই প্রকল্পকে সফল করার জন্য আরো কতিপয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করে। এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে চট্টগ্রামের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে এবং এই ব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশ বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।[৫১]

বাংলাদেশে কোরীয় চিকিৎসকদল প্রেরণ

KOICA-র পক্ষ থেকে আফ্রিকা, এশিয়া, প্রশান্ত-মহাসাগরীয় অঞ্চল এবং লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশসহ যে সব অঞ্চলের মানুষের চিকিৎসা সেবার মান খুবই নিম্ন এবং অপর্যাপ্ত সে সব এলাকায় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য চিকিৎসক দল প্রেরণ করে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় কোরীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে কোরীয় চিকিৎসকগণ বিদেশে মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে। এই কর্মসূচির আওতায় কোরীয় চিকিৎসক দলের সদস্যরা স্থানীয় কমিউনিটি হাসপাতাল তৈরির মাধ্যমে চিকিৎসাসেবা প্রদান করে থাকেন। কেবলমাত্র মানবতাবাদ ও স্বাস্থ্যসেবার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এই চিকিৎসাসেবাকে দরিদ্র দেশের চিকিৎসা সেবার মান বিবেচনা করে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

KOICA কর্তৃক অনুসৃত উপরোক্ত মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিকিৎসকদের আন্তরিক সেবার কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। সাং তে-কিম এ প্রক্রিয়া শুরুর ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছেন যে, কোরীয় চিকিৎসকদেরকে প্রথম আফ্রিকার দেশগুলোতে প্রেরণ করা হয়। কোরীয় উপদ্বীপের পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৬০ সালের দিকে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে প্রথম আফ্রিকার দেশগুলোতে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এভাবে ১৯৬৮ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রায় ১০৩ জন চিকিৎসককে ৩৬টি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ৩৬টি দেশে যেসব কোরীয় চিকিৎসকদেরকে প্রেরণ করা হয় তার মধ্যে ১৬ টিই ছিল আফ্রিকার দেশ। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে ১৪ জন চিকিৎসককে আফ্রিকার দশটি দেশে প্রেরণ করা হয় এবং ২ জনকে পাঠানো হয় পশ্চিম সামোয়াতে।[৫২]একই ধারাবাহিকতায় KOICA বিভিন্ন রোগ নির্ণয় এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য এবং বাংলাদেশী চিকিৎসকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে তোলার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, ক্লিনিক, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র, প্রভৃতি স্থানে কোরীয় চিকিৎসকগণকে প্রেরণ করে। এরপর থেকে কোরীয় চিকিৎসকগণ বাংলাদেশে অবস্থান করে এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এক্ষেত্রে কোরীয় চিকিৎসকগণ যে বিষয়গুলোকে বিবেচনায় আনে তা হলো স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন প্রকল্প, ঔষধ ব্যবহারের নিয়ম-কানুন, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, চিকিৎসাসেবা ও পরিবার-পকিল্পনা পদ্ধতি যক্ষা নিরাময়, রোগবিদ্যা, ব্যাকটেরিয়া বিদ্যা, যক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা, প্রসূতি বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশী চিকিৎসক, স্বাস্থ্য নীতি নির্ধারক ও প্রশাসকদেরকে কোরীয় অভিজ্ঞতায় প্রশিক্ষণ দান করা প্রভৃতি। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা

কেন্দ্র ও রোগ নির্ণয় কেন্দ্রে ঔষধের ব্যবহার, চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানদানসহ রোগ নির্ণয়ের সর্বাধুনিক চিকিৎসা সেবা খাতকে আরো আধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি ভিত্তিক করে তোলে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে ৪৬৯ জন কোরীয় চিকিৎসক বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্বরত ছিলেন। এসব চিকিৎসকদের মধ্যে শিশু বিশেষজ্ঞ, অর্থপেডিকস, প্যাথলজিষ্ট, আকুপাংচার বিশেষজ্ঞ এবং যক্ষ্মা রোগ বিশেষজ্ঞ অর্ন্তভূক্ত ছিল। ক্ষেত্র বিশেষে এসব কোরীয় চিকিৎসকদেরকে কোরিয়ান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, শিশু হাসপাতাল, পিজি হাসপাতাল, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের বিভিন্ন হাসাপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশের মত বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশের জন্য KOICA-র পক্ষ থেকে পাঠানো এই চিকিৎসকের সংখ্যা গণনার দিক থেকে কম হলেও এসব চিকিৎসক বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী চিকিৎসা সেবার ভিত্তিভূমি ও উন্নতমান নিশ্চিত করেছেন এবং বাংলাদেশের চিকিৎসা ইতিহাসে চিকিৎসার ক্ষেত্রকে প্রয়োজনীয় আধুনিকতা দানের চেষ্টা করেছেন।[৫৩]

তায়েকান্দো প্রশিক্ষকদেরকে বাংলাদেশে প্রেরণ

KOICA-র পক্ষ থেকে কোরিয়ার ঐতিহ্যবাহী মার্শাল আর্টকে (সামরিক কলা) Taekwondo বলা হয়। এটি এখন বাংলাদেশের মার্শাল আর্ট-এর নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। একটি উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসীদের শারীরিক ফিটনেসের জন্য কোরিয়ার পক্ষ থেকে এই কলা শিক্ষাদান করা হয়। এর আরো একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, কোরীয় সংস্কৃতিকে তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশীদের কাছে আরো পরিচিত করে তুলতে আগ্রহী। এভাবে তারা কোরীয় মার্শাল আর্টকে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচারের মাধ্যমে তায়েকোন্দো (Taekwondo) মার্শাল আর্টকে বাংলাদেশের মানুষের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও মেধা বিকাশের নির্দেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একই প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিন জাপান সরকার জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (JICA)-র সহায়তায় বাংলাদেশে জুডো ও কারাতে এ দুটি বিষয়ে বাংলাদেশীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৯১ সাল থেকে কোরিয়া সরকার এ ধারণা পোষন করতে থাকে যে, জাপান হয়তো বাংলাদেশীদের আত্মরক্ষা ও শারীরিক ফিটনেসের জন্য বাংলাদেশে জাপানীদের ঐতিহ্য পুরোপুরিভাবে বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এজন্য কোরীয় সরকার ২০০০ সালের সিডনি অলিম্পিক উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী যুবকদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। Taekwondo মার্শাল আর্ট নামে

পরিচিত এই শারিরীক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাংলাদেশী যুবকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তা দ্রুত সারা দেশে বিস্তার লাভ করে।

১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত KOICA বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় বাংলাদেশের ঢাকা ও রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে তায়েকান্দো মার্শাল কলায় নির্দেশক হিসেবে কোরীয় বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করে। এসব প্রশিক্ষক তাদের বক্তৃতা ও শারীরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশীদেরকে মার্শাল আর্ট শিক্ষা প্রদান করতে থাকে যা বাংলাদেশীদের কাছে ইতোমধ্যে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।[৫৪] ২০০৭ সালে বাংলাদেশে KOICA-র পক্ষ থেকে তায়েকান্দো প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রায় ৬৬,০০০ মার্কিন ডলার ব্যয় করা হয়।

বাংলাদেশে কোরীয় বিশেষজ্ঞ সহায়তা প্রদান

বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোরিয়ার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পৌছে দেওয়ার জন্য KOICA বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সেক্টর বা খাতের কোরীয় বিশেষজ্ঞদেরকে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাঠানো হচ্ছে এবং এসব বিশেষজ্ঞ তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা স্বাগতিক দেশগুলোর উন্নয়নের গতিধারা ত্বরান্বিত করেছে। এসব বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ, কৃষিবিদ, বনজসম্পদ উন্নয়নবিদ, বিদ্যুত বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় উন্নয়ন বিষয়ক গবেষক এবং জরিপকারকগণ এর নাম উল্লেখযোগ্য। এসব বিশেষজ্ঞ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা বিভিন্ন সেমিনার, শিক্ষা ও পরামর্শের মাধ্যমে কিভাবে মানব সম্পদ, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়ন করা যায় সে সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে থাকে।

বাংলাদেশেও কোরীয় বিশেষজ্ঞদের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কারণ বাংলাদেশের প্রায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে এসব বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণ এবং পরামর্শে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে এসব বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হয়। এগুলো হলো গ্রামীণ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প, যেমন-(শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরন), গ্রামীণ অর্থনীতি ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা,Gender development,সমবায় ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি। KOICA বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়।[৫৫] KOICA-র বহুমুখী সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের কয়েকটি এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নতির একটি গতিধারা ফিরে আসে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের মত বিপুল চাহিদাসম্পন্ন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় KOICA-র সহায়তার পরিমাণ হয়তো

খুব বেশী নয়। কিন্তু তাদের সেবা এবং সহায়তা কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি মজবুদ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জোরালো সম্ভবনা দেখা দিয়েছে যা বাংলাদেশের ভঙ্গুর ও দূর্বল অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশে KOICA-র সহযোগিতামূলক ভূমিকা দূর্বল অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে বিশেষভাবে অবদান রাখবে। এছাড়া আধুনিক নগরায়ন, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি,স্বাস্থ্যসেবা, তথ্য প্রযুক্তি এবং কোরীয় ভাষা শিক্ষা দানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আর্ন্তজাতিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সম্পূরক করে তুলতে সহায়ক হবে। একুশ শতকে বিশ্বায়ন ও উন্মুক্তবাজার অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে যে সব দেশ ও সংস্থা সহায়তা করে চলেছে KOICA নি:সন্দেহে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। KOICA-র সহায়তায় বাংলাদেশে ক্রমশ: এমন একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে উঠছে যা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যতা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে এবং একটি স্বনির্ভর জাতি হিসেবে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করবে।

তথ্য নির্দেশঃ

১. Toru Yanagihara,(1993), æJapan's Foreign Aid to Bangladesh:Challenging the Dependency Syndrome?" in Bruce M. Koppel and Robert M.Orr,Jr.(ed) *Japan's Foreign Aid: Power and Policy in a New Era* (Boulder:Westview),188-203.

২. Rehman Sobhan, (1982), *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh*.(Dhaka:University Press)

৩. Sang-Tae Kim,(2006), æDevelopment Cooperation Strategy of KOICA and KOV program" in *The 9th Consultation Meeting on the Korea Overseas Volunteers Program: Effective Ways to Align the KOV Program with Development Strategies* (Seoul:KOICA,) pp.48-49.

৪. Khairul Kabir,(2006) æKorea Overseas Volunteers(KOV) Program in Bangladesh" in *The Ninth Consultation Meeting on the Korea Overseas volunteers program:Effective Ways to Align*

the KOV Program with Development Strategies (Seoul:KOICA,) pp.63-73.

৫. Sang-Tae Kim, *ODA Policy of ROK*, p.26.

৬. প্রাগুক্ত,

৭. Khairul Kabir, æKorea Overseas Volunteers (KOV) Program in Bangladesh”

৮. Kabir, æKorea Overseas Volunteers (KOV) Program in Bangladesh .” p.65 .

৯. প্রাগুক্ত, p.66.

১০. KOICA, æProcedings of the Ninth Consultation Meeting on the Korea Overseas Volunteers Program, 2006”, pp. 71-72

১১. KOICA : Country Program-Bangladesh, 2007.

১২. প্রাগুক্ত,

১৩. Sang Tae Kim, æCooperation for Agricultural Development between Korea and Indochina,” p.5.

১৪. প্রশিক্ষণার্থীদের বাছাই ও মনোনয়ন প্রক্রিয়ার জন্য দ্রষ্টব্য, KOICA, 2006: *International Training Program*,2006.

১৫. Sang Tae Kim, *ODA policy of ROK*, p.24.

১৬. প্রাগুক্ত, pp.24-25.

১৭. প্রাগুক্ত, pp.24-25.

১৮. KOICA, KOICA Annual Report, 2007.

১৯. প্রাগুক্ত,

২০. KOICA : Country Program-Bangladesh, 2007.

২১. KOICA, International Training Program,2006, p.25

২২. প্রাগুক্ত,

২৩. KOICA, 2006, p. 21.

২৪. Interview of Oh Yeon Keum, Education and Training team 2, Human Resources Development Department, KOICA, Dated, March 27,2007.

২৫. প্রাগুক্ত,

২৬. KOICA, (1997) *Koreans in the Global Village-Korean NGOs Foreign Aid Activities*. p.4.

২৭. Yoon, æTrade, Diplomacy, and Humanitarianism" p,30 এবং আরো দ্রষ্টব্য, KOICA 1997. *Koreans in the Global Village- Korean NGOs Foreign Aid Activities*,p.293.

২৮. Sang Tae-Kim, ODA policy of ROK, p.113.

২৯. Interview of Dr. Chang Hyun-sik, Managing Director of KOICA, Dated, November 29, 2006 at the KOICA building Office, Seoul .

৩০. Annual Report of the KDAB, NGO, 2005 (Translated by Oh Yeon Keum, KOICA Official) .

৩১. Annual Report of Good Neighbors International NGO, 2002 (Translated by Oh Yeon Keum, KOICA Official).

৩২. KOICA : Country Program- Bangladesh, 2007.

৩৩. Interview of Oh-Yeon Keum, KOICA Official.

৩৪. KOICA, 1997, Annual Report 1996, p.131, তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, appendix .

৩৫. Ministry of Foreign Affairs, Korea`s ODA .

৩৬. Interview with Dr. Chang Hyun- sik .

৩৭. Record of discussions of the project for the construction of a Bangladesh-Korea Friendship Hospital, at Saver, Dhaka. December19,1994. KOICA Official Record .

৩৮. Record of discussions between KOICA and University of Dhaka on the project for the establishment of a Korea Language

Center at the Institute of Modern Language, University of Dhaka 5.11.1997. Record of KOICA .

৩৯. KOICA কর্তৃক প্রদেয় তথ্য-প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি এবং সহায়তার তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, Record of discussions between the Implementation Survey Team of the Republic of Korea and University of Dhaka, Bangladesh relatig to the project for establishment of a Center for Advanced Research and Development of Science and Technology at the University of Dhaka. June 28, 2001. in KOICA Official Record.

৪০. Records of discussions between the Implementation Survey Team of the Republic of Korea and the Computer Council, Ministry of Science and Information & Communication Technology of people`s Republic of Bangladesh relatig to the project for establishment of a Center for Advanced Research and Development in Science and Bangladesh-Korea Information & Communication Technology, 29th September, 2003.

৪১. Record of Discussions (RD) between the Implementation Survey Team of the Republic of Korea and Bureau of Education Information & Statistics (BANBEIS) of the Ministry of Education of the People`s Republic of Bangladesh on the project for the Establishment of Bnagladesh-Korea Institute of Information & Communication Technology, May 4, 2006, আরো দ্রষ্টব্য, KOICA Report, 2006 and 2007, and Country Program for Bangladesh .

৪২. KOICA-Country Report-Bangladesh, 1991-2006.

৪৩. Bangladesh Computer Council, Ministry of Science and Information & Communication Technology, æSouvenir, Inauguration: BCC Bhaban & BKIICT” July 28, 2005.pp.24-25.

৪৪. Country Program on Bangladesh of KOICA, 2007.

৪৫. Yoon, æTrade, Diplomacy, and Humanitarianism" p.19.

৪৬. KOICA,1998, æKOICA`s Report to the Committee Unification, Diplomacy and Trade in the 198th National Assembly Session in 1999," P.177-195. The list of provision of equipment in 1997-99.

৪৭. Yoon, æTrade, Diplomacy, and Humanitarianism" p.19.

৪৮. Sang Tae-Kim, *ODA policy of ROK*, p.27.

৪৯. KOICA Statistics, 1991-2005.

৫০. KOICA Statistics, 2006.

৫১. KOICA: Country Program- Bangladesh, 2007.

৫২. KOICA, 2006 p.19.

৫৩. Sang Tae Kim, *ODA policy of ROK*, p.26.

৫৪. KOICA, Annual Report, 2006.

৫৫. Kabir, KOVs.

ষষ্ঠ অধ্যায়

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি, ১৯৮৭-২০০৭

১৯৮০-র দশকের শেষ ভাগ থেকেই বাংলাদেশের নাগরিকেরা দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাজ করতে গমন করে। পরবর্তীতে Industrial Trainee System বা ITS চুক্তি ব্যবস্থার অধীনে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েক হাজার বাংলাদেশী দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমিক ও অন্যান্য পদে কাজ করতে আসে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে এসব শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তারা দক্ষিণ কোরিয়ার অবৈধভাবে অবস্থান ও কাজ করতে থাকে। এমতবস্থায় বৈধভাবে শ্রমিক আমদানির জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ২০০৭ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের সাথে শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত EPS বা Employment Permit System চুক্তি স্বাক্ষর করে। ফলে অন্যান্য কয়েকটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সাড়ে ছয় হাজার শ্রমিক দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকরি লাভের সুযোগ লাভ করে। আবার বাংলাদেশে অবস্থিত কোরীয় শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানেও অসংখ্য বাংলাদেশী কর্মরত রয়েছে।

১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়। এই উন্নতি ও পরিবর্তন ৭টি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। কিন্তু ১৯৯৩ সালের পর থেকে উন্নতির যে ধারা লক্ষ্য করা যায় তাকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-একটি শিল্পায়ন শ্রেণীবিভাগ বা Industrial Classification এবং অপরটি পেশাগত শ্রেণীবিভাগ বা Occupational Classification. ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পকারখানায় কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের ওপর ব্যাপক বিপর্যয় নেমে আসে। ফলে ভারী ও ক্ষুদ্র উভয় শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা সীমিত হয়ে পড়ে। এমনকি এসময় রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানায়ও কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, এসময়ের মধ্যে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৬২০,০০০-এ নেমে আসে। কিন্তু পরবর্তীতে উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২,৭০,০০০ এ উন্নীত হয়।

এদিকে অদক্ষ বা স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা অর্থাৎ করণিক শ্রেণীর শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ৬০,০০০ জনে এবং আরো নিম্ন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিক বা কায়িক শ্রমিকের সংখ্যা ৮৩,০০০ জনে নেমে আসে। ফলে দক্ষ ও উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকরা অবকাঠামো নির্মাণ কারখানা তৈরিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং তাদের এই অবদান মোট কর্মরত শ্রমিকের ৭.৯ শতাংশে উপনীত হয়।[১]

১৯৭০-এর দশকে কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারায় পরিবর্তন আসে। এসময়ের মধ্যে পরিবর্তন আসে মানুষের রুচি ও অভ্যাসের যা দেশটিকে আরো উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ অধিক কার্যপোযোগী পণ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করে। এছাড়াও এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার ভোক্তা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, বিশ্বরোড স্থাপন ও এর নকশা তৈরি, ফ্লাইওভার নির্মাণ ও রাস্তা প্রশস্তকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এছাড়া কোরিয়ার শুল্ক নির্ধারণ ও তা আদায়ের ক্ষেত্রে নতুন নীতি চালু হয়। সুতরাং দক্ষিণ কোরিয়ার অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে সকল ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের ধারা অনুভূত হতে থাকে।

এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় এলাকায় অভিবাসন প্রক্রিয়া

বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষ এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে বসবাস করে। United Nation Development of Economic and Social Affairs-এর ২০০৫ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের ১৯১ মিলিয়ন অভিবাসীর মধ্যে ৫৩ মিলিয়ন অভিবাসী এই এলাকার অধিবাসী। ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এশীয়-প্রশান্তমহাসাগরীয় এলাকার অভিবাসীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব অভিবাসীর অধিকাংশ উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং তেল সম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে।[২]

১৯৯০-এর দশকে এশিয়ার উন্নয়নশীলদেশগুলোর ক্ষেত্রে অভিবাসন প্রক্রিয়া জোরদার হয়। এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় শ্রমিক রপ্তানির ক্ষেত্রে। স্বল্পোন্নত দেশগুলো অধিক জনসংখ্যার পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ব্যর্থতার দরুণ নতুন শিল্পোন্নত দেশে শ্রমিক রপ্তানির চেষ্টা করতে থাকে। তবে সকল দেশে শ্রমিক রপ্তানির জন্য দক্ষতার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। দেশ ত্যাগকারী অভিবাসী কিংবা প্রবাসী কর্মসন্ধানী শ্রমিকদের চাহিদার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ব্রুনেই, হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড উল্লেখযোগ্য। এসব দেশ এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশ, যেমন-বাংলাদেশ, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, নেপাল,পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা এবং ভিয়েতনাম থেকে শ্রমিক আমদানি করে থাকে।[৩] তবে এ অঞ্চলের অভিবাসন প্রক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী হলেও শ্রমিকদের মধ্যে একই স্থানে দীর্ঘ দিন যাবৎ অবস্থান করার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে অভিবাসী সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হলেও পশ্চিমা দেশগুলোতে শ্রমিক

আন্দোলনের পটভূমি, মধ্যপ্রাচ্যে শ্রমিক রপ্তানি, আন্ত-এশীয় শ্রমিক বিনিময়, দক্ষ শ্রমিকদের আন্দোলন, শিক্ষার্থী স্থানান্তর, শরনার্থী সংক্রান্ত মামলা প্রভৃতির ওপর আলোকপাত করা হবে। তবে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে অবৈধ অভিবাসী সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর। এই প্রক্রিয়াটি বেশি বিস্তার লাভ করে পর্যটন ভিসার মাধ্যমে। কারণ এই ভিসাটি অতিসহজেই পাওয়া যায় এবং চোরাকারবারীরা এই ভিসাকে তাদের কার্যক্রমের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এই ভিসা ব্যবহারের প্রক্রিয়া এশিয়ার দেশগুলোতে অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে লক্ষ্য করা যায়।[৪] দক্ষিণ কোরিয়ার বাংলাদেশী শ্রমিকেরাও ২০০০ সাল পর্যন্ত পর্যটন ভিসার মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যায় আগমন করে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় বিদেশী শ্রমিকের আগমন

১৯৯৩ সালের নভেম্বরে Industrial Trainee System চালুকরনের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া বিদেশী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি উন্নত নীতিমালা চালু করে। এই নীতির আওতায় শ্রমিকদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে যাতে তারা কোরিয়ার উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের ন্যায় কাজ করতে পারে এবং চাকরি ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারে। এভাবে ২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে Work Permit System এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি প্রদান করে। এই Work Permit System-টি অনেকাংশে Industrial Trainee System-এর সাথে সংযুক্ত ছিল বিধায় শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ২০০৭ সাল থেকে Industrial Trainee System-কে পুরোপুরিভাবে Work Permit System এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। আবার ২০০৭ সালে Working Visit নামে নতুন একটি কর্মসূচি চালু করা হয় যার আওতায় অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ বিদেশী শ্রমিক কোরিয়াতে গমন ও সেখানে কাজ করার অধিকার লাভ করে। উল্লেখ্য যে, Working Visit Program ছাড়াও Work Permit System এর মাধ্যমেও এসব অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের কোরিয়াতে কাজ করার অধিকার অব্যাহত রাখা হয়।[৫] স্বল্পদক্ষ বিদেশী শ্রমিকেরা কেবলমাত্র Work Permit System-এর অধীনে প্রসাধনী শিল্প, নির্মাণ শিল্প, চাকুরি, উপকূলীয় মৎস আহরণ, মৎস্য উৎপাদন এবং মৎস্য খামার নির্মাণ, মাছের রেণু সংগ্রহ এবং কৃষি ও পশুপালন ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার লাভ করে। কিন্তু Working Visit Program-এর অধীনে কোরিয়াতে আগমনকারী বিদেশী শ্রমিকদের

Work Permit System-এ আগমনকারী শ্রমিক অপেক্ষা বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন কাজের অধিকার প্রদান করা হয়। তাদেরকে Work Permit System এর কর্মচারীদের কাজকর্ম দেখাশুনা,রেস্টুরেন্ট পরিচালনা, ব্যক্তিগত সেবিকা ও ব্যক্তিগত গৃহস্থালী কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়।[৬]

১৯৮৭ সাল থেকে ২০০৭ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়াতে ভিসা প্রদানের মাধ্যমে বিদেশী কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়াতে বিদেশী শ্রমিক ছিল মাত্র ৬,০০০ জন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র প্রসাধনী নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে এই শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর পেছনে যে কারণটি দায়ী ছিল তা হলো দক্ষিণ কোরিয়াতে বৈধভাবে আগমণকারী শ্রমিকেরা তাদের অবস্থানের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবৈধভাবে এখানে অবস্থান করতে থাকে। অন্যদিকে, ১৯৯৪ সালে Industrial Trainee System-এর অধীনে কম দক্ষ শ্রমিকেরা দক্ষিণ কোরিয়াতে আগমন করতে থাকে এবং এই আগমনের মাত্রা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে তাদের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি হয়ে যায়। একদিকে অবৈধভাবে বসবাসকারী অপর দিকে অদক্ষ শ্রমিকের আগমন দেশটিতে বিদেশী শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ২০০৩ সাল নাগাদ অবৈধভাবে অবস্থানকারী শ্রমিক সংখ্যা মোট বিদেশী শ্রমিকের শতকরা ৭৯.৮ শতাংশে উপনীত হয় এবং বৈধভাবে কোরিয়াতে আগমনকারী শ্রমিকের বাজারও স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে কোরীয় সরকার কোরিয়াতে অবস্থানরত শ্রমিকদের বৈধতা প্রদান করতে থাকেন। কোরীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত এই পদক্ষেপের ফলে অবৈধ বিদেশী শ্রমিকদের সংখ্যা ৩৫.৫ শতাংশে নেমে গেলেও পরবর্তীতে আবার তা বৃদ্ধি পায়।[৭]

২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে কোরিয়া সরকারের এক সমীক্ষা অনুযায়ী Working Visit-এর আওতায় কোরিয়াতে আগমনকারী বিদেশী শ্রমিকের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ৩৯৫,০০০জন। এদের মধ্যে বৈধ ভিসার মাধ্যমে আগমনকারী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৮৩০৪৮ জন বা ৪৬.৫ শতাংশ। বাকী ২০১,৪৫৭ জন বা ৫১.৩ শতাংশ শ্রমিক আসে অবৈধ পন্থায়। অবৈধ ভিসা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগমনরত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২৭,৪৭৩ জন বা ৬৯.৬ শতাংশ যাদের অধিকাংশই ছিল অপেশাদার। অবশিষ্ট ২১,৩২৮ জন বা ১১.৭ শতাংশ কোরিয়াতে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিল এবং বাকী ৩৪,২৪৭ জন বা ১৮.৭ শতাংশ পেশাদারী ভিসার মাধ্যমে কোরিয়াতে আগমন করে।[৮]

নিম্নে একটি সারণীর মাধ্যমে কোরিয়াতে বাৎসরিক ভিত্তিতে অবস্থানরত বিদেশী শ্রমিকের একটি তালিকা উপস্থাপন করা হলোঃ

সাল/গড়	মোট বিদেশী শ্রমিক	শ্রমিক ভিসা	প্রশিক্ষন প্রদানকারী কোং	প্রশিক্ষন প্রদানকারী শিল্প	অবৈধ অভিবাসী
১৯৮৭৮.১২	৬,৪০৯(১০০.০)	২,১৯২(৩৪.২)	-	-	৪,২১৭(৬৫.৮)
১৯৮৮.১২	৭,৪১৯(১০০.০)	২,৪০৩(৩২.৪)	-	-	৫,০০৭(৬৭.৬)
১৯৮৯.১২	১৪,৬১০(১০০.০)	২,৪৭৪(১৬.৯)	-	-	১২,১৩৬(৮৩.১)
১৯৯০.১২	২১,২৩৫(১০০)	২,৮৩৩(১৩.৩)	-	-	১৮,৪০২(৮৬.৭)
১৯৯১.১২	৪৪,৮৫০(১০০.০)	২,৯৭৮(৬.৬)	-	-	৪১,৮৭৭(৯৩.৪)
১৯৯২.১২	৭৩,৮৬৮(১০০.০)	৩,৩৯৫(৪.৬)	৪,৯৪৫(৬.৭)	-	৬৫,৫২৮(৮৮.৭)
১৯৯৩.১২	৬৬,৯১৯(১০০.০)	৩,৭৬৭(৫.৬)	৮,৬৪৪(১২.৯)	-	৫৪,৫০৮(৮১.৫)
১৯৯৪.১২	৮১,৮২৪(১০০.০)	৫,২৬৫(৬.৪)	৯,৫১২(১১.৬)	১৮,৮১৬(২৩.০)	৪৮,২৩১(৫৮.৯)
১৯৯৫.১২	১২৮,৯০৬(১০০.০)	৮,২২৮(৬.৪)	১৫,২৩৮(১১.৮)	২৩,৫৭৪(১৮.৩)	৮১,৮৬৬(৬৩.৫)
১৯৯৬.১২	২১০,৪৯৪(১০০.০)	১৩,৪২০(৬.৪)	২৯,৭২৪(১৪.১)	৩৮,২৯৬(১৮.২)	১২৯,০৫৪(৬১.৩)
১৯৯৭.১২	২৪৫,৩৯৯(১০০.০)	১৫,৯০০(৬.৫)	৩২,৬৫৬(১৩.৩)	৪৮,৭৯৫(১৯.৯)	১৪৮,০৪৮(৬০.৩)
১৯৯৮.১২	১৫৭,৬৮৯(১০০.০)	১১,১৪৩(৭.১)	১৫,৯৩৬(১০.১)	৩১,০৭৩(১৯.৭)	৯৯,৫৩৭(৬৩.১)
১৯৯৯.১২	২১৭,৩৮৪(১০০.০)	১২,৫৯২(৫.৮)	২০,০১৭(৯.২)	৪৯,৪৩৭(২২.৭)	১৩৫,৩৩৮(৬২.৩)
২০০০.১২	২৮৫,৫০৬(১০০.০)	১৯,০৬৩(৬.৭)	১৮,৫০৪(৬.৫)	৫৮,৯৪৪(২০.৬)	১৮৮,৯৯৫(৬৬.২)
২০০১.১২	৩২৯,৫৫৫(১০০.০)	২৭,৬১৪(৮.৪)	১৩,৫০৫(৪.১)	৩৩,২৩০(১০.১)	২৫৫,২০৬(৭৭.৪)
২০০২.১২	৩৬২,৫৯৭(১০০.০)	৩৩.৬৯৭(৯.২)	১৪,০৩৫(৩.৯)	২৫,৬২৬(৭.১)	২৮৯,২৩৯(৭৯.৮)
২০০৩.১২	৩৮৮,৮১৬(১০০.০)	২০০,০৩৯(৫১.৫)	১১,৮২৬(৩.০)	৩৮,৮৯৫(১০.০)	১৩৮,০৫৬(৩৫.৫)
২০০৪.১২	৪২১,৬৪১(১০০.০)	১৯৬,৬০৩(৪৬.৬)	৮,৪৩০(২.০)	২৮,১২৫(৬.৭)	১৮৮,৪৮৩(৪২.৭)
২০০৫.১২	৩৪৫,৫৭৯(১০০.০)	১২৬,৪৯৭(৩৬.৬)	৬,১৪২(১.৮)	৩২,১৪৮(৯.৩)	১৮০,৭৯২(৫২.৩)
২০০৬.১২	৪২৫,১০৭(১০০.০)	১৯৪,১৯৫(৪৫.৬)	৫,৮৩১(১.৪)	৩৮,১৮৭(৯.০)	১৮৬,৮৯৪(৪৪.০)
২০০৭.১১	৩৯৩,৩৩১(১০০.০)	১৮৩,০৪৮(৪৬.৫)	৪,৪৯৩(১.১)	৪,৩৩৩(১.১)	২০১,৪৫৭(৫১.৩)

Notes:1)Legal immigrant status work visa holders=non-professional workers(E9)+professional workers(E1~E7,E10)+training employment (E8)visa holders.

2)As of the end of November 2007, the number of immigrants dose not include those who are not economicallyactive (15 years or younger and 61 years and older; 21,436 persons).

3.As of the end of November 2007, the 205,857 workers on working visits (H-2) are not included in the number of legal immigrants.

উৎস: Ministry of Justice,Korea.

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকের কর্মসংস্থান

দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাজ করার জন্য বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে একটি জনশক্তি রপ্তানি চুক্তি স্বাক্ষর করে যা Memorandum of Understanding বা MoU নামে পরিচিত। ২০০৮ সালে Employment Permit System (EPS)-এর আওতায় বাংলাদেশের শ্রমিক সিউলের বিভিন্ন কারখানায় কাজ করার অধিকার লাভ করে। দক্ষিণ কোরিয়া ২০০৭-২০০৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৫টি দেশ থেকে ১৫০,০০০ শ্রমিক কোরিয়ার কারখানাগুলোতে কাজ করার জন্য নিয়োগ দান করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে বলা হয় যে, বাংলাদেশ কত দ্রুত জনশক্তি রপ্তানি করতে পারবে তা নির্ভর করছে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার আলোচনার মাধ্যমে। এছাড়া বাংলাদেশ ৩০,০০০-এর অধিক শ্রমিক পাঠানোর জন্য উচ্চ পর্যায়ে আরো অধিক আলোচনা করার ঘোষণা প্রদান করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র থেকে আরো জানা যায়, যে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ, নেপাল, মিয়ানমার, পূর্বতিমূর এবং কিরঘিজিস্তান থেকে অধিকসংখ্যক জনশক্তি আমদানির ঘোষণা প্রদান করেছে।[৯]

Employment Permit System-এর আওতায় রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে যেসব বাংলাদেশী শ্রমিক দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পকারখানাতে কাজ করার জন্য গমন করে তাদের মাথাপিছু পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয় ৯০০-২০০০ মার্কিন ডলার। এ প্রক্রিয়ায় ২০০০ সাল থেকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে পুনরায় জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং দীর্ঘদিনের আলাপ-আ্যালোচনার পর কোরীয় সরকার ২০০৬ সালের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ থেকে ১২০০ শ্রমিক দক্ষিণ কোরিয়ার কারখানায় কাজ করার জন্য এদেশ থেকে সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যদিও সাম্প্রতিকবছরগুলোতে দক্ষিণ কোরিয়া রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে বাংলাদেশী শ্রমিক দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রেরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কারণ বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়াতে

শ্রমিক প্রেরণ বাবদ এজেন্সিগুলো প্রতিটি শ্রমিকের কাছ থেকে প্রায় ১০ থেকে ১২ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেছে যাকে দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃপক্ষ নিয়ম-নীতির চূড়ান্ত লংঘন হিসেবে অভিহিত করে।[১০]

বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানির প্রক্রিয়ায় উভয়দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, জনশক্তি রপ্তানি মন্ত্রণালয় ও কর্মকর্তা পর্যায়ে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ২০০৭ সালে ঢাকা-সিউল জনশক্তি আমদানি-রপ্তানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মাধ্যমে Employment Permit System (EPS)-এর আওতায় বাংলাদেশী শ্রমিকেরা দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন,অবস্থান ও কাজ করার অধিকার লাভ করে।[১১] এভাবে ২০০৪ সালে দক্ষিণ কোরিয়া বিদেশী শ্রমিকদের জন্য EPS পদ্ধতি চালু করে যাতে শ্রমিকেরা খুব সহজেই সেদেশে গমনও কাজ করতে পারে। এসময় থেকে উভয় দেশের মধ্যে বিরাজমান ITS পদ্ধতি বা Industrial Trainee System বাতিল করা হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সাল থেকে বাংলাদেশী শ্রমিকরা ITS চুক্তির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করতো। কিন্তু এই পদ্ধতির ফলে বাংলাদেশী বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো দূর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ফলে কোরীয় সরকার শুধুমাত্র সরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসময় কোরীয় সরকার বাংলাদেশী শ্রমিকদের জন্য কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণা দান করে। EPS পদ্ধতির আওতায় পৃথিবীর ১৫টি দেশ থেকে ২৪,৪০০জন শ্রমিক দক্ষিণ কোরিয়াতে আমদানি করা হয় যার মধ্যে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৪৪০০।[১২] বিগত বছরে এ সংখ্যা ছিল ৩৮০০ জন। এসময় দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমান দাঁড়ায় ১.০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার Overseas Employment Ministry-র একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে EPS পদ্ধতি কেবলমাত্র অভিবাসন খরচই হ্রাস করেনি বরং তা বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির দূর্নীতি দমন করে গরীব ও দক্ষ শ্রমিকদের কোরিয়াতে যাওয়ার পথ সুগম করেছে এবং তাদেরকে আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনে আরো বেশি উৎসাহিত করে তুলেছে। ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকরি অনুসন্ধানকারী শ্রমিকদের ব্যয় হয় মাত্র ৫৪,০০০টাকা, যেখানে মালয়েশিয়াতে গমনের জন্য ব্যয় হয় ৮৪,০০০টাকা।[১৩] বাংলাদেশের জন্য শ্রমিক অভিবাসন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬.২৬ মিলিয়ন বাংলাদেশী বিদেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে যা বাংলাদেশের দেশীয় চাকরির বাজারকে কিছুটা হলেও স্থিতিশীলতা দান করেছে।[১৪]

জনশক্তি রপ্তানি ও দেশীয় দালাল

কোরীয় সরকার কোন বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে জনশক্তি আমদানি না করলেও এক শ্রেণীর দেশীয় দালাল এদেশের মানুষকে দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে সর্বস্বান্ত করছে। বর্তমানে এদেশে অসংখ্য মধ্যস্বত্ত্বভোগী গ্রুপ বা প্রতিষ্ঠান এবং দালালশ্রেণী রয়েছে যারা দাবি করে যে, কোরীয় সরকারের সাথে তাদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে এবং কেবলমাত্র তারাই কোরিয়াতে শ্রমিক পাঠানোর বৈধ অধিকারী। কিন্তু এ ধরণের প্রচারনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক। এসব কারণে কোরীয় সরকার বাংলাদেশ থেকে কেবলমাত্র BOESL বা Bangladesh Overseas Employment Services Limited-এর মাধ্যমে মানব সম্পদ আমদানি করতে আগ্রহী এবং এই প্রতিষ্ঠান যেসব শ্রমিককে চিহ্নিত করবে কেবলমাত্র তাদেরকেই কোরিয়ায় শ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এই কার্যক্রমকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশের BOESL এবং দক্ষিণ কোরিয়ার Ministry of Labor একটি বিশেষ রিক্রুটিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করে যা Employment Permit System বা EPS নামে পরিচিত।

এভাবে বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়া উভয় দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থের বিবেচনায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের কোরিয়ার শিল্প-কারখানায় কাজে নিয়োগ করার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়। এর চূড়ান্ত পর্বে ২০০৭ সালের ৪ জুন বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারদ্বয় মানবসম্পদ প্রেরণ সংক্রান্ত একটি Memorandam of Understanding (MoU) চুক্তি স্বাক্ষর করে।[১৫] বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব আব্দুল মতিন চৌধুরী এ চুক্তির বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেন যে, “দক্ষিণ কোরিয়াতে জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত কোন রিক্রুটিং এজেন্সি বাংলাদেশে নেই এবং এ কারণে অনেক যাচাই-বাছায়ের পর, যেমন- অভিবাসন খরচ, মেডিকেল টেস্টসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পাদন সাপেক্ষে একজন বাংলাদেশী শ্রমিককে এখন দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়।” পরবর্তীকালে বিভিন্ন গণমাধ্যম, প্রচারপত্র, পত্রিকা, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, এবং জনমুখের প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ দক্ষিণ কোরিয়া গমনের ব্যয় সম্বন্ধে অবহিত হয়। এভাবে এই গমনাগমনের ব্যয় কেবলমাত্র বাংলাদেশ ও কোরীয় সরকার আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী শ্রমিকদের কর্মে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া গমনকারী বাংলাদেশী শ্রমিকদের কোরীয় শ্রমমন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত কোরীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করা এবং কোরীয় ভাষা বুঝতে, লিখতে, পড়তে এবং অনর্গল কথা বলা শিখতে হয়। যেসব শ্রমিক

কোরীয় ভাষা রপ্ত করতে পারে কেবলমাত্র তাদেরকেই কোরিয়ায় যাওয়ার অনুমতি এবং কোরিয়া সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয় এবং তাদের বেতন কাঠামো কেমন হবে তাও তাদেরকে অবহিত করা হয়। এভাবে কোন দালাল বা বেসরকারি এজেন্সির মধ্যস্থতা ছাড়াই কেবলমাত্র যোগ্য শ্রমিকগণ দক্ষিণ কোরিয়ায় যাওয়ার অনুমতি লাভ করে থাকে এবং অল্প খরচে এবং কোন প্রকার জটিলতা ছাড়াই বর্দ্ধিত বেতনে চাকরির সুযোগ লাভ করেছে। বর্তমান দক্ষিণ কোরিয়াতে বাংলাদেশী শ্রমিকের সংখ্যা কত এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। কারণ এই পরিসংখ্যানের বিশুদ্ধতা নির্ভর করে কি পরিমান লোক কোরীয় ভাষা শিক্ষায় পাস করেছে তার ওপর। কোরীয় সরকার বর্তমানে EPS ব্যবস্থাধীনে আরো ১০,০০০ শ্রমিক বাংলাদেশ, মিয়ানমার, কিরঘিজিস্তান এবং পূর্ব তিমুর হতে আমদানি করার কথা ঘোষণা করেছে।[১৬]

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী জনশক্তি

১৯৯৪ সালে প্রথম বেসরকারিভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকরা Industrial Trainee System (ITS)-এর অধীনে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করে। এসব বিদেশী শ্রমিককে দক্ষিণ কোরিয়ার মানব সম্পদ উন্নয়ন সংস্থা ব্যবহার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে।[১৭] তবে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের অধিকাংশই অবৈধভাবে অবস্থান করছে। এসব শ্রমিক বিভিন্ন এজেন্সি ও দালালের সহায়তায় কোরিয়াতে গমন করে। কিন্তু তাদের অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তারা দেশে প্রত্যাবর্তন না করে অবৈধভাবে অবস্থান করতে থাকে। আবার অনেক বাংলাদেশী নাগরিক ভ্রমনের উদ্দেশ্যে গমন করার পর আর নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন নি। পর্যটন ভিসায় গমনকৃত এসব অভিবাসীর সংখ্যা কম নয়। বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ কোরিয়া গমন করা বাংলাদেশীর সংখ্যা ও উল্লেখ করার মত। ১৯৯০ এর দশকে ১৬১,০০০ শ্রমিকের ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও তারা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছে না।[১৮]

২০০৪ সালের আগষ্ট মাসে কোরীয় শ্রমমন্ত্রণালয় দক্ষিণ কোরিয়ায় আগত বিদেশী শ্রমিকদের ওপর প্রথম জরিপ কার্যক্রম শুরু করে। ফলে Employment Permit System ACT টি কার্যকর রূপ পরিগ্রহ করে। এ আইনের আওতায় অভিবাসী শ্রমিকদেরকে দক্ষিণ কোরিয়ায় কাজ করার জন্য ৩ বছরের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং শ্রমিক আমদানি সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর কিছুটা শর্তারোপ করা হয়। এ সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, যে সকল শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে কোরিয়াতে অবস্থান করছে এবং যাদের বৈধতার মেয়াদ ৪ বছরেরও বেশি অতিক্রম করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অথবা তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে এবং চাকরির প্রমাণপত্র ছাড়া কোরিয়াতে চাকুরিরত শ্রমিকদের ওপর বড় অংকের আর্থিক জরিমানা আরোপ করা হয়। Amnesty International-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিক অবৈধভাবে অবস্থান করছে।[১৯] অবৈধভাবে অবস্থানকৃত এসব শ্রমিকদের আবার অনেকেই বেকার জীবন যাপন করছে এবং তারা খুব সস্তায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েও বিপজ্জনক অবস্থায় কাজ করে চলেছে।[২০] পরিসংখ্যান থেকে আরো জানা যায় যে, দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রায় ৩৬১,০০০ বিদেশী শ্রমিক কর্মরত আছে যার মধ্যে মাত্র ৭২,০০০ বা ১৯.৯ শতাংশ শ্রমিকের বৈধতা রয়েছে এবং ২৪৯,০০০ শ্রমিকের বা ৮০.১ শতাংশের কোন বৈধ কাগজপত্র নেই। প্রায় ৪৮ বিলিয়ন বিদেশী শ্রমিক দক্ষিণ কোরিয়ায় বসবাস করছে এবং ০.৬ শতাংশ অবৈধ শ্রমিক এ সংখ্যার সাথে যোগদান করে এই জনসংখ্যাকে আরো বর্দ্ধিত করেছে।[২১]

এদিকে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার তার দেশে জনশক্তি আমদানি সংক্রান্ত ১০টি নীতিমালার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। এই নীতিমালার কঠিন শর্তগুলো পালন করে বর্তমানে সেদেশে জনশক্তি আমদানি করা হয়। তবে সেখানে অবৈধভাবে যাওয়া ও অবস্থানরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে তেমন কোন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সেদেশে জনশক্তি রপ্তানি করতে Employment Permit System বা EPS-এর যেসব কঠিন শর্ত পালন করতে হয় এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তা মানতে বাধ্য করা হচ্ছে না। তবে EPS-এর কঠিন শর্ত সম্বলিত তালিকা বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করে এসব শর্ত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি করার জন্য দেশটি আবেদন জানাবার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সম্পর্কে বলা হয় যে, বাংলাদেশ যদি খুব শীঘ্রই সে দেশে অবস্থানরত অবৈধ বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে তাহলে দেশটি বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক অব্যাহত রাখবে। অবশেষে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর সিউলে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসে কোরীয় কর্তৃপক্ষ 'Industrial Trainee Systeem' বা ITS-এর অধীনে বাংলাদেশ থেকে প্রথম জনশক্তি আমদানির জন্য আবেদন করে। এভাবে ২০০৫ সালে ২০০ জন এবং ২০০৬ সালে একইভাবে ১০১০ জন বাংলাদেশীকে দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। তবে এই ব্যবস্থা EPS এর কঠিন শর্তের আওতামুক্ত ছিল।[২২]

সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রমবাজার হাতছাড়া হয়ে না যাবার জন্য সেদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী শ্রমিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রথমত: বাংলাদেশ সরকার দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশ করে যে, খুব দ্রুত দক্ষিণ কোরিয়াতে অবৈধভাবে অবস্থানরত সকল বাংলাদেশী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনা হবে; এবং দ্বিতীয়ত: পাসপোর্ট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করে যে, কোরিয়াতে অবৈধভাবে অবস্থানকারী শ্রমিকদের পাসপোর্ট নবায়ন করা যাবে না। এরপর দক্ষিণ কোরিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থানকারী বাংলাদেশী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের পর ২০০৬ সালের জুলাই মাসে কোরিয়া সরকারের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করেন। এর আগে অর্থাৎ ২০০৬ সালের ১৪ মার্চ কোরীয় কর্তৃপক্ষ ১০টি দেশকে প্রজাতন্ত্রী কোরিয়াতে জনশক্তি রপ্তানির অনুমতি প্রদান করে। এগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া এবং চীন।[২৩] দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০০৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি আরো ৫টি দেশ, যথা- বাংলাদেশ, নেপাল, মিয়ানমার, কিরঘিজিস্তান, এবং পূর্বতিমূরকে দক্ষিণ কোরিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির অনুমতি প্রদান করে। এ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত MoU চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা দক্ষিণ কোরিয়ায় বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির দ্বার উন্মোচন করে।[২৪] পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ৩-৬ জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা কোরিয়া সফর করেন এবং সিউলে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ Asian Country Dialogue (ACD) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত এক সভায় মিলিত হন। সেখানে ৮ জুন উভয়দেশের প্রতিনিধি একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন যেখানে ২০০৭ সালের মার্চ থেকে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে কোরিয়াতে ৪৯,৬০০ বিদেশী শ্রমিক রপ্তানি করা যাবে বলে উল্লেখ করেন। এ সময় জনশক্তি রপ্তানির জন্য ৫টি খাত চিহ্নিত করা হয়। এগুলো হলো: খ) ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ৪২,১০০ জন; খ) কনস্ট্রাকশন খাতে ৪,৪০০জন; গ) শিল্পসেবা খাতে ২০০ জন; ঘ) কৃষি ও গুদামজাতকরণ খাতে ১৯০০ জন; এবং ঙ) মৎস সম্পদ খাতে ১০০০ জন। এসময় Bangladesh Overseas Employment Service Limited (BOESL)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে EPS-এর অধীনে বাংলাদেশী শ্রমিকদের কোরিয়াতে নিয়োগ, মার্কেটিং অথবা পদোন্নতি দেওয়া যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়। ফলে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিরা EPS-এর অধীনে বাংলাদেশী শ্রমিকদের তাদের দেশের সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দানে খুবই আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করা হয় যে, কোন কারণে EPS-এর শর্ত অবমাননা করা হলে ঐ শ্রমিক দুর্নীতির অপরাধে দায়ী হবে এবং তাকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে।[২৫]

প্রবাসী শ্রমিক ইউনিয়নের (Migrated Trade Union) বা MTU-এর কার্যক্রম

এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ২০০৭ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১১,৫৮৯ জন বাংলাদেশী শ্রমিক অবৈধভাবে কর্মরত রয়েছে। এসব শ্রমিক দক্ষিণ কোরিয়ায় নানা রকম কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে। ফলে কোরীয় সরকার এ সব শ্রমিককে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ঘোষণা প্রদান করে। এ ঘোষণা দানের পর পরই কোরিয়াতে অবস্থানকারী ও কর্মরত সকল শ্রমিক দেশটিতে ধর্মঘটসহ ভাঙচুর শুরু করে এবং স্থানীয় গির্জা, মানবতাবাদী গোষ্ঠী, এন জি ও এবং অন্যান্য সমর্থক গোষ্ঠীর সহায়তায় কোরিয়াতে অবস্থান করার উপায় অনুসন্ধান করতে থাকে।[২৬] সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ ২০০৮-২০১০ সালে কোরিয়া সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অনেক গির্জা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ সরকার বৈধভাবে বাংলাদেশের জনশক্তিকে দক্ষিণ কোরিয়াতে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকার সময় কোরিয়ার প্রবাসী শ্রমিক ইউনিয়ন বা Migrated Trade Union (MTU)-এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, প্রবাসী শ্রমিক ইউনিয়ন (MTU) কোরিয়াতে গঠিত বিদেশী শ্রমিকদের একটি অবৈধ প্রতিষ্ঠান এবং এর সমস্ত কার্যক্রম বিদেশে অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশী নেতৃবৃন্দের দ্বারা অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যান্য অনেক দেশের সাথে প্রায় ৩০০ প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিক এই প্রবাসী শ্রমিক ইউনিয়ন (MTU)-এর সদস্য। ফলে কোরিয়া সরকার পুনরায় প্রবাসী শ্রমিক ইউনিয়ন (MTU)-এর বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপন করে এবং তাদের সময় ও অবৈধ অবস্থান সমন্ধে হুশিয়ার করে দেয়। কোরিয়া সরকার ঘোষণা প্রদান করে যে, প্রবাসী শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মকান্ড EPS-এর নীতি বর্হিভূত এবং তা বাংলাদেশী শ্রমিক নির্বাচনে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করেছে। কোরিয়া সরকারের মতে এসব অবৈধ প্রবাসী শ্রমিকদের বৈধ করার কোন ইচ্ছা সরকারের নেই এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে না যায় তাহলে সরকার EPS ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে জোর করে দেশে ফেরত পাঠাবে।[২৭] কোরিয়া সরকারের অপর এক হুশিয়ারীতে বলা হয় যে, অবৈধ প্রবাসী শ্রমিকদের উচিত হবে স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে যাওয়া এবং EPS পদ্ধতির মাধ্যমে বৈধভাবে পুনরায় কোরিয়াতে প্রবেশ করা। কিন্তু কোরিয়া সরকারের কথায় কর্ণপাত না করে প্রবাসী শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা অবৈধভাবে অবস্থান করতে থাকলে কোরিয়া সরকার EPS-এর নীতিতে কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে এবং পরিবর্তিত বিধান অনুযায়ী কোরিয়াতে শ্রমিকদের অবস্থানের সময়সীমা, সুযোগ-সুবিধা ও বেতন কাঠামো

অনেকাংশে হ্রাস করা হয় এবং শাস্তি হিসেবে তাদের জন্য অনুন্নত বাসস্থান ও কর্মপরিবেশ নির্ধারণ করা হয়। তাদেরকে কঠোর নিয়ম-নীতি পালন এবং বেকার জীবন-যাপনে বাধ্য করা হয়। প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতি কোরীয় সরকারের এই বিরূপ আচরণকে আন্তর্জাতিক মানবতা গোষ্ঠী কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে এবং কোরীয় সরকারকে অতি দ্রুত এই আচরণ পরিত্যাগের আহবান জানায়।[২৮]

দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী অভিবাসী

১৯৬০সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়া অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করতে থাকে।[২৯] ফলে শিল্প-কারখানায় অধিক পণ্য উৎপাদনের জন্য অধিক জনশক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ এশিয়ার অধিকাংশ দেশ থেকে শ্রমিক সংগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ করে। এভাবে ১৯৯৪ সালে Industrial Trainee System-এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করা শুরু করে এবং এভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের নিকট দক্ষিণ কোরিয়ার কর্মসংস্থানের দ্বার উন্মোচন হয়। এভাবে শুরু হয় বাংণাদেশের কর্মসন্ধানী মানুষদের দক্ষিণ কোরিয়ায় আগমন প্রক্রিয়া। ২০০৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রায় ১৩০,০০০ বাংলাদেশী কর্মরত রয়েছে যাদের অধিকাংশই অবৈধ অভিবাসী।[৩০] ২০০৯ সালে কোরীয় চলচ্চিত্র পরিচালক সিন ডং ইল (Sin Dong-il) দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশী অভিবাসীদের নিয়ে "বান্ধবী" নামে একটি সিনেমা তৈরি করেন।[৩১] এই ছবি থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থানকৃত বাংলাদেশী অভিবাসীদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জানা যায়।[৩২]

১৯৯৭-৯৮ সালে এশিয়ার দেশগুলোতে যে অর্থনৈতিক মন্দা আঘাত হানে তার নেতিবাচক প্রভাব দক্ষিণ কোরিয়াতেও অনুভূত হয়। অর্থাৎ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার সাথে দক্ষিণ কোরিয়াতেও অর্থনৈতিক মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয় যার ফলে দেশটিতে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের সংখ্যা এক বছরের মধ্যে ৪২,০০০ থেকে ১৭,০০০-এ হ্রাস পায়। এই হ্রাসকৃত শ্রমিক সংখ্যার মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া এর অর্থনৈতিক ঘাটতি কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করে। এ সম্পর্কে সিউলে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাসের প্রথম সচিব জনাব সৈয়দ নাসির এরশাদ বলেন, "দক্ষিণ কোরিয়া এর অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে ওঠার সাথে সাথে বিদেশী শ্রমিক আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।" এই ধারাবাহিকতায় Industrial Organization for Migration (IOM) নামক সংস্থা ১৫জন বাংলাদেশী শ্রমিকের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করে।[৩৩] একইভাবে ২০০৭ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ২০০৮ সালের জুন মাস থেকে প্রতি বছর ৫,০০০ বাংলাদেশী

শ্রমিককে দক্ষিণ কোরিয়াতে কর্মে নিয়োগের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করে। এই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের মধ্যে কোরিয়ার Bureau of Manpower Employment and Training ১৫২১জন বাংলাদেশী শ্রমিককে কর্মসংস্থানের জন্য গ্রহণ করে। ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ কোরিয়াতে ২০,০০০ বাংলাদেশী শ্রমিক কর্মরত আছে। এসময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা: দিপুমনি বাংলাদেশী দূতাবাসে বিরাজমান সমস্যা দ্রুত সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন। একইসাথে তিনি বাংলাদেশ থেকে অধিক পরিমাণ অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ শ্রমিক আমদানি করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সরকারকে অনুরোধ করেন।

কোরীয় ভাষা শিক্ষা পরীক্ষা

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণ কোরিয়াতে বাংলাদেশী শ্রমিক রপ্তানির অধিকার লাভ করে। তবে এসব শ্রমিককে কোরীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ক পরীক্ষা বা Korean Language Test (KLT)-এ উত্তীর্ণ হতে হয়। এ ব্যবস্থাধীনে যে সমস্ত বাংলাদেশী শ্রমিক Employment Permit System (EPS)-এর আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় কাজ করতে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে সফলতার সাথে কোরীয় ভাষা শিক্ষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত কোরিয়ার মানব সম্পদ বিভাগ কেবলমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থীদের চাকরির দরখাস্ত পূরণ করার অধিকার প্রদান করে। ঢাকা শহরে অবস্থিত ৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং ১ঘন্টা সময়ব্যাপী এ পরীক্ষার প্রথমে লিখিত এবং পরে ভাষাগত দক্ষতা সংক্রান্ত মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।[৩৪]

প্রার্থীর যোগ্যতা এবং প্রাক-নিবন্ধন

কোরীয় ভাষা শিক্ষালাভের পর দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মসংস্থানের জন্য গমন করতে ইচ্ছুক বাছাইকৃত বাংলাদেশী শ্রমিকদের নিম্নলিখিত শর্ত পালন করতে হয়। যথা- ১.তাদের বয়স ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে; ২.বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোন কারণে ফৌজদারী অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের ইতিহাস থাকতে পারবে না; ৩. কোরীয় সরকার বা এজেন্সি কর্তৃক জোরপূর্বক ফেরৎকৃত কোন শ্রমিক এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না; ৪. উভয় দেশের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণের বা মেনে চলার মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে।[৩৫] তবে মূল নিবন্ধন সম্পন্ন করার আগে এসব প্রার্থীদের একটি প্রাক-নিবন্ধন কর্মসূচি পালন করতে হবে। এসময় তাদেরকে প্রথম ও দ্বিতীয় দিন বিভাগীয় কোটায় প্রার্থীতা অর্জনের জন্য নিবন্ধন করতে হবে। তবে প্রথম ও

দ্বিতীয় দিনে বিভাগীয় কোটা পূরণ না হলে তৃতীয় দিনে কোন বিভাগীয় কোটা ছাড়াই সরাসরি প্রার্থী গ্রহণ করা হবে। BOESL-এর নোটিশ অনুযায়ী প্রাক-নিবন্ধনের জন্য কোটা ভিত্তিক প্রার্থী গ্রহণ করা হবে। এছাড়া শারীরিক পরীক্ষায় কোন ত্রুটি ধরা পড়লে প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে। BOESL-এর নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রাক-নিবন্ধনের ফরম, নিয়মাবলী, টেস্টের স্থান, সময়, দরখাস্ত জমাদানের শেষ তারিখসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রদান করা হয়।[৩৬] দক্ষিণ কোরিয়া গমন করতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের প্রাক-নিবন্ধনী পরীক্ষায় উত্তীর্ন হবার পর তাদেরকে আবার নিবন্ধন করতে হবে এবং নিবন্ধনের তারিখ, সময়, স্থান প্রভৃতি BOESL-এর নোটিশের মাধ্যমে প্রার্থীদের অবহিত করা হয়। এ সকল দায়িত্ব দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয় এবং কোরিয়ার মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের BOESL-এ প্রক্রিয়ার সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে থাকে।[৩৭]

দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী নিয়োগের বিষয় সারসংক্ষেপ

২০০৭সালের ৪ জুন বাংলাদেশ সরকার ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে MoU কার্যকর করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রনালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন সংস্থা বা Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) এবং Bangladesh Overseas Employment and Services Ltd. (BOESL) এর মধ্যে গত ০৯/১২/২০০৭ এবং ১১/০৬/২০০৮ তারিখে “The Service Commitment Agreement of EPS-KLT" স্বাক্ষরিত হয়। EPS এর আওতায় বাংলাদেশ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

১. EPS-এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়া যেতে আগ্রহী প্রার্থীদেরকে প্রথমে কোরীয় ভাষা (Korean Leanguage Test) বা KLT পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। বোয়েসেলের সহযোগিতায় কোরিয়ার মানব সম্পদ উন্নয়ন সংস্থা বাংলাদেশে কোরিয়া ভাষার পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কেবলমাত্র কোরিয়া ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য HRD, Korea অনুমোদিত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফর্মে প্রার্থীর বেতন, চাহিদা ও পছন্দের চাকরিক্রম এবং অন্যান্য তথ্যসহ আবেদন গ্রহণ করা হয়।

২. চাকরির আবেদন পত্রের অনুরূপ HRD, Korea কর্তৃক ইনস্টলকৃত SPAS Software এর মাধ্যমে আবেদন পত্রের তথ্যসমূহ রোস্টারভূক্ত করার উদ্দেশ্যে অনলাইনে HRD, Korea SPAS Software-এ আপলোড করা হয়। HRD, Korea যাচাই-বাছাই শেষে উক্ত আবেদন পত্রগুলো কোরীয় মালিকপক্ষের উদ্দেশ্যে তালিকাভূক্ত করেন। কোন আবেদন পত্রে ভুল থাকলে তা সংশোধন করার জন্য বোয়েসেলের নিকট ফেরৎ পাঠায়। বোয়েসেল এ ফেরতের কারণ দেখে তা সংশোধন করে HRD, Korea তে প্রেরণ করে। উল্লেখ্য যে, EPS পদ্ধতিতে প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন হতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া গমন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কার্যক্রম কম্পিউটারে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

৩. রোস্টার থেকে KLT ও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ন প্রার্থীদের তালিকা হতে কোরীয় কোম্পানির মালিকগণ তাদের পছন্দমত কর্মী নির্বাচন করে থাকেন। কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে EPS-এর আওতাভুক্ত ১৫টি দেশ কতজন প্রার্থী তালিকাভূক্ত করতে পারবে তার সংখ্যা প্রকাশ করে থাকে। প্রতিটি দেশ এ জন্য নির্ধারিত সংখ্যক কর্মীর আবেদনপত্র তালিকাভূক্ত করতে পারবে, যা কোটা নামে পরিচিত।

৪. কেবল তালিকাভূক্ত কর্মীদের মধ্য হতে কোরীয় মালিকগণ কর্মী নির্বাচনের সুযোগ পান। এ প্রক্রিয়ায় কারা নির্বাচিত হবেন তা সম্পূর্নরূপে কোরিয়ার মালিকের বিষয়। কোরীয় সরকারও তা নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে না। তাই তালিকাভূক্ত কর্মীদের মধ্য হতে কতজন প্রার্থী শেষ পর্যন্ত নিয়োগ পাবে তা সম্পূর্নভাবে কোরিয়ার মালিকদের ওপর নির্ভর করে। ফলে তালিকাভূক্ত সকল কর্মী নিয়োগ পাবেন এর কোন নিশ্চয়তা নেই। এ কারণে কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি হতে সকল পর্যায়ের বিজ্ঞাপনে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, পরীক্ষায় পাশ করা বা চাকরির আবেদন করা কোরিয়ায় চাকরির নিশ্চয়তা বহন করে না।

কোরিয়া গমনকারী প্রার্থীদের খরচের বিবরণ (একজন প্রার্থীর খরচ)ঃ

ক্র/ নং	বর্ণনা	টাকা	USD	মন্তব্য
১	পরীক্ষার নিবন্ধন ফি(Regisrtration fee)	১১৮২	১৬.৮৮	
২	মেডিকেল চেক আপ ফি(মেডিকেল সেন্টারে নগদ) (Medical Test)	২৪৫০	৩৫	
৩	বোয়েসেল ডাটাবেইজ রেজিস্ট্রেশন ফি(BOESL Database registration fee)	২০০	২.৮৫	

৪	ভিসা স্টাম্পিং ফি (VISA Stamping fee)	৩৫০০	৫০	
৫	বিমান টিকেট (ট্যাক্সসহ) (Air fare with tax)	৩১৫০০	৪৫০	পরিবর্তনশীল (Changeable)
৬	বিএমইটি কল্যাণ ফি (BMET welfare fee)	১৩৯৫	১৯.৯২	
৭	বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন ফি(BMET registration fee)	৮০	১.১৫	
৮	বোয়েসেল সার্ভিস চার্জ (BOESL Service Charge)	১৩৪৯৪	১৯২.৭৭	
	মোট=	৫৩৮৫১	$৭৬৮.৫৭	

তথ্যঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোয়েসেল, ঢাকা ।

বিকল্প পথে দক্ষিণ কোরিয়া গমন

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ পর্যটন অথবা ব্যবসায়ী ভিসায় দক্ষিণ কোরিয়া গমন করে। ঢাকায় অবস্থিত কোরীয় দূতাবাস থেকে দক্ষিণ কোরিয়া গমনের জন্য পর্যটন বা ব্যবসায়ী ভিসা সংগ্রহ করা খুব সহজ। এ ভিসার মাধ্যমে অতি সহজেই বিমানবন্দরের অভিবাসী কাউন্টার অতিক্রম করা যায় এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল বিমান বন্দরেও এতে কোন প্রকার ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয় না। এছাড়া সিউল বিমানবন্দরে এসব পর্যটন বা ব্যবসায়ী ভিসায় গমনকারীদের খুব সম্মান করা হয়।[৩৮] পর্যটন ভিসায় দক্ষিণ কোরিয়ায় যেতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ৪০০০মার্কিন ডলার ব্যয় হয় এবং কোরিয়াতে খরচ বাবদ কিছু টাকা সঙ্গে রাখতে হয়। তবে কোন কারণে পর্যটন ভিসা বাতিল হলে সঙ্গে সঙ্গে ৪০০০মার্কিন ডলার ফেরত দেয়া হয় ।

দক্ষিণ কোরিয়া গমন করতে ইচ্ছুক যাত্রীদের বিমান ভাড়াসহ বিভিন্ন খরচ বাবদ ৪৫০০মার্কিন ডলার ব্যয় হয়। সেক্ষেত্রে দেশীয় দালালরা ব্যক্তি প্রতি ১ লক্ষ টাকা আদায় করে থাকে যার ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে খরচ দাড়ায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা। তবে পর্যটন ভিসায় গমনকারী ব্যক্তি যদি তাৎক্ষণিকভাবে কোন চাকরি পেয়ে যায় তাহলে তাদের চাকরি লাভের ৭-৮ মাসের মধ্যেই এতদ্সংক্রান্ত সমুদয় খরচের টাকা উঠে আসে। এজন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় যেসমস্ত এজেন্সি লোক প্রেরণ করে তারা অধিকাংশ সময় পর্যটন ভিসা ব্যবহার করে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, পর্যটন ভিসায় লোক প্রেরণে কোন ঝামেলা বহন করতে হয় না এবং যাত্রীরা অতি সহজেই সিউল বিমানবন্দরের অভিবাসী কাউন্টার অতিক্রম করতে পারে। এভাবে বাংলাদেশ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া গমনের জন্য খরচ হয় মাত্র ৪০০০মার্কিন ডলার। এজন্য বাংলাদেশের স্থানীয় দালালরা সব সময় পর্যটন ভিসায় লোক পাঠানোর চেষ্টা করে থাকে এবং এর মাধ্যমে তারা অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকা লাভ করে। তাছাড়া পর্যটন

ভিসায় গমনকারী ব্যক্তি সহজেই এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে চাকরি লাভ করে এবং এভাবে অতি সহজেই তারা তাদের খরচকৃত টাকা আয় করতে সক্ষম হয়।[৩৯]

দক্ষিণ কোরিয়ায় মানব সম্পদ প্রেরণের ক্ষেত্রে দালাল শ্রেণী একটি বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এসব দালালদের মধ্যেও আছে শ্রেণী বিভাগ। সাধারণভাবে এসব স্থানীয় দালালদের দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- অস্থায়ী দালাল এবং স্থায়ী দালাল। অস্থায়ী দালালেরা বিভিন্ন কৌশলে বিদেশগামী ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা আদায় করে এবং তাদের লক্ষ্য থাকে কেবলমাত্র অভিবাসী কাউন্টার পর্যন্ত ব্যক্তিকে পৌছে দেওয়া। তবে এসব দালাল বিদেশে শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে খুব কমই সফল হয় এবং মানুষজনও তাদের খুব একটা বিশ্বাস করে না। আর স্থায়ী দালালেরা ব্যক্তিকে সিউলে পৌছে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে দেশে ফিরিয়ে আনার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এছাড়া আরো এক শ্রেণীর দালাল আছে যারা বিদেশগামী মানুষদের প্রায় নিঃস্ব করে ফেলে। এদের সংখ্যা নগন্য এবং তারা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। এসব দালাল ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে আলাপ-আলোচনা পূর্বক স্থানীয় লোকদের ঢাকায় এনে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে। এসব কারণে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনকারী মানুষ যাতে কোন প্রকার হয়রানির শিকার না হয় সেজন্য কোরীয় সরকার কোরীয় ভাষা শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সরাসরি লোক নিয়োগের রীতি চালু করেছে। ভাষাগত দক্ষতার মাধ্যমে কোরিয়াতে গমনকৃত বাংলাদেশী নাগরিকরা খুব দ্রুত এবং উচ্চ বেতনের / মজুরিতে চাকরি লাভ করে থাকে।[৪০]

কর্মসন্ধানী বাংলাদেশীদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া কর্মসংস্থানের একটি বড় বাজার সৃষ্টি করেছে এবং বাংলাদেশীরা দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পকারখানাগুলোতে কাজ করে উভয় দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৪ সালে Industrial Trainee System চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়াতে শ্রমিক রপ্তানির অধিকার লাভ করে এবং বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রায় ১০,০০০ বাংলাদেশী শ্রমিক অবৈধভাবে কাজ করছে। এ কারণে কোরিয়ার শ্রম মন্ত্রণালয় ২০০৭ সাল থেকে Employment Permit System (EPS)-এর অধীনে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আমদানির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কোরীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ৪ জুন সিউলে দু'দেশের মধ্যে একটি Memorandam of Understanding (MoU) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ষষ্ঠ ACD পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সভায় যোগদান উপলক্ষে সিউল সফর গেলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর

মাধ্যমে EPS এর আওতায় বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়াতে শ্রমিক প্রেরণের অধিকার লাভ করে। দক্ষিণ কোরিয়াতে গমনকৃত এসব বাংলাদেশী শ্রমিক কোরিয়ার বিভিন্ন শিল্পকারখানা, অবকাঠামো নির্মাণ, নির্মাণ শিল্প, কৃষি ও শস্য সংরক্ষণ, এবং মৎস্য সম্পদ আহরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ লাভ করে।[৪১]

২০০৭ সালের ১১ নভেম্বর প্রকাশিত *The Financial Express* পত্রিকার এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, æBangladesh's manpower export to South Korea is likely to start soon under a fresh deal, which the two countries will sign later this week, official sources said".[৪২] এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, কোরীয় সরকার আবারও বাংলাদেশী কর্মসন্ধানী মানুষের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে বাংলাদেশীদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া গমন সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে। এসময় দু'দেশের সরকার জনশক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতির জন্য আলোচনায় বসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং এ প্রক্রিয়ায় Bangladesh Overseas Employment Services (BOESL) কোরীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ বিভাগের সাথে জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের কথা বলেন। এ প্রসঙ্গে *The Financial Express* পত্রিকাকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে BOESL-এর জনৈক কর্মকর্তা বলেন, "We will sit this week to sign a final deal with the Human Resources Division (HDR) of the Ministry of Labor of South Korean Government."[৪৩] তিনি বলেন, দ্বৈত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলে দক্ষিণ কোরিয়ায় মানব শক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আর কোন বাধা থাকবে না। উল্লেখ্য যে, কোরিয়ার শ্রমমন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদ বিভাগ কোরিয়া গমনকারী বাংলাদেশীদের কোরীয় ভাষার দক্ষতা যাচায়ের জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের অনুমতি প্রদান করে।[৪৪]

তথ্য নির্দেশ:

১. Byung-Hee Lee/ Hye-Won Kim/Jin-Ho Jeong/Seong Jae Cho,(eds),[2007], *Labor in Korea 1987~2006: Looking through the Statistical Lens*. (Seoul: Korea Labor Institute) pp.9-10.

২. http:// www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm? ID=733.

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. Byung-Hee Lee, *Labor in Korea_* pp.150-740 এবং pp.63-64.

৬. প্রাগুক্ত p.64.

৭. প্রাগুক্ত.pp.64-65.

৮. প্রাগুক্ত.pp.65-66

৯. http://www.bdsdf.org/forum/index.php?showtopic=32793.http://www.newagebd.com/front.htm/#15.

১০. প্রাগুক্ত.

১১. http://readnpay.blogspot.com/2010/10/07manpower-export-to-s korea…http://www.thefinancialexpress-bd.com

১২. প্রাগুক্ত.

১৩. প্রাগুক্ত.

১৪. প্রাগুক্ত.

১৫. http://www.bangladeshnews.com.bd./2007/07/22/manpower-export-to-south-korea-fraud-br….1/1/1990

১৬. প্রাগুক্ত.

১৭. http:bangladesheconomy.wordpress.com/2010/03/27/manpower exp…http://www.thefinancialexpress-bd.com/more,php?news id=96181

১৮. http://migration.uedavis.edu/mn/more.php?id=827_0_3-0

১৯. http://gvnet.com/humantrafficking/SouthKorea.htm

২০. http://shafiur.i-edit.net/?p=441,
"we are warriors:Bagladeshimmigrant workers in South Korea impe……"

২১. প্রাগুক্ত.

২২. প্রাগুক্ত.

২৩. æU.S.State Department Bulletin, Trafficking in Persons Report," June,2009 [Full Country Report]

২৪. প্রাগুক্ত.

২৫. প্রাগুক্ত.

২৬. mostlywater.org/node/1104,"South Korean Labor Laws Reduce Migrant Workers to Slaves."

২৭. প্রাগুক্ত.

২৮. www.state.gov/g/drls/hrrpt/2005/61613.htm

২৯. The World Factbook,U.S.C.I.A.2009

৩০. http:www.en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh-South_korea_relations.http://www.kukinews.com/news/articale/view.asp?page=1&g code=kmi&arcid=0920948635&cp=nv)

৩১. Bandhobi(http:www.imdb.com/title/tt157055/)at the Internet Movie Database.

৩২. Admissions as of 12July 2009."
"Bandhobi(movie-2009).(http://www.hancinema.net/korean-movie-Bandhobi.php)".

৩৩. http://www.independent-bangladesh.com/2009/02211437/business/s…

৩৪. http://www.korea-bangla.com/announcement.php1/1/1990

৩৫. প্রাগুক্ত.

৩৬. প্রাগুক্ত.

৩৭. প্রাগুক্ত.

৩৮. প্রাগুক্ত.

৩৯. প্রাগুক্ত.

৪০. RECRUITMENT AND PLACMENT OF BANGLADESHI MIGRANT WORKERS AN EVALUATION OF THE PROCESS. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) NOVEMBER 2002.UNDP.DHAKA.ISBN:984-32-0435-2.pp.26-28.

৪১. প্রাগুক্ত.

৪২. æKorea May Import More from Bangladesh to Improve Balance”- interview with Ambasador Mustafa Kamal of Bangladesh in Seoul: *The Korea Post* March,2007.

৪৩. *The Financial Express*, Archive News of Sunday, November 11, 2007. http://www.thefinancial express bd.com/more.php? news_id=16910&date=2007-11- 11.

৪৪. প্রাগুক্ত.

উপসংহার

পারস্পরিক সমঝোতা, নিবিড় বন্ধুত্ব, উষ্ণ আন্তরিকতা এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব এসব কিছুর সমন্বয়ে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উভয় দেশই জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে কতিপয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শকে সামনে রেখে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে জোরদার করে চলেছে। উভয় দেশই জাতিসংঘসহ বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, সমিতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। উভয় সরকারই তাদের পারস্পারিক সহযোগিতা এবং উন্নতির স্বার্থে কাজ করে চলছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে জ্বালানিখাত, বিদ্যুৎ উৎপাদনখাত, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, সাংস্কৃতিক খাত, খেলাধূলা ও যুব উন্নয়নসহ বিজ্ঞান ও কারিগরি প্রযুক্তি উন্নয়নের জন্যও বিভিন্ন প্রকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ইতোমধ্যে এসব চুক্তির আওতায় সহযোগিতামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়াও বেসামরিক বিমান চলাচল চুক্তি, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত সহযোগিতা, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ভ্রাম্যমান পর্যটন সুবিধা এবং ভ্রমন সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধামূলক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে।[1] উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক এমন অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক চুক্তি (জুলাই ২১, ১৯৭৩); বিমান চলাচল চুক্তি (ফেব্রুয়ারি ১৩, ১৯৭৯); ভিসা প্রক্রিয়াকরন চুক্তি (জুন ১৪, ১৯৭৯); সাংস্কৃতিক চুক্তি (জুন ১৪, ১৯৭৯); দ্বৈতকর পরিহার এবং আয়করের প্রতি সম্মান প্রদর্শনহেতু অর্থনৈতিক অরাজকতা পরিহার চুক্তি (মে ১০, ১৯৮৩); বিনিয়োগসংক্রান্ত উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা চুক্তি (জুন ১৮, ১৯৮৮); অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি (ডিসেম্বর ০৯, ১৯৮৩); কোরিয়ার চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সংক্রান্ত চুক্তি (ডিসেম্বর ২১, ১৯৮৫); এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা চুক্তি (জুন ১৮, ১৯৮৬) প্রভৃতি।[2]

কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮৫ সালে দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি যৌথ পরিষদ বা কমিশন গঠন করা হয়।[3] এই কমিশনে সর্বমোট তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর প্রথম আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালে সিউলে এবং এতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী। এ সময় অর্থাৎ ১৯৯৩ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে

অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা সংক্রান্ত একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[4] উল্লেখ্য যে, এই সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে আরো তিনটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাটি ১৯৮৬ সালের জুন মাসে ঢাকায়, দ্বিতীয়টি ১৯৮৭ সালের আগষ্ট মাসে সিউলে, এবং তৃতীয়টি ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত যৌথ কমিশনের সম্মেলনটি শেষ হওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও পরবর্তী সম্মেলন এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, ১৯৯৩ সালের সম্মেলনের পরবর্তী সম্মেলন আরো নিম্ন কর্মকর্তা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ সম্মেলনটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর পরিবর্তে পররাষ্ট্র সচিব কিংবা সহকারি পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এই সম্মেলনের তারিখ ও সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে।

১৯৭৯ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে বেশ কয়েকটি সফর বিনিময় হয়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী লী ইয়াং কুক (Lee Yung Kuk) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ১৯৯৪ সালের ২-৪ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশ আসেন। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এটিই ছিল রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর। এদিকে প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ এবং World Trade Organization (WTO)-এর সেক্রেটারি জেনারেল পদের জন্য আবেদন করে। এ সময় বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়াকে সহায়তা প্রদান করতে থাকে। এ সময় দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয় এবং বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য, যেমন-পাট, পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, তৈরি পোশাক এবং দক্ষ ও অদক্ষ জনশক্তি আমদানি করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি আহবান জানায়। বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার সহায়তার অংশ হিসেবে এসব খাতে কোরীয় বিনিয়োগকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৫ সালের ২৫-২৭ মে এক রাষ্ট্রীয় সফরে দক্ষিণ কোরিয়া সফর করেন। এর প্রতিসফর হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিম সুক সু (Kim Suk Soo) ২০০২ সালের ৮-১০ নভেম্বর বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময় দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই

চুক্তিটি সংক্ষেপে সমঝোতা স্মারক বা MoU নামে পরিচিত। এই চুক্তির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের চট্রগ্রাম, সিলেট ও খুলনাতে ডিজিটাল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের জন্য ৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করে এবং রেলওয়ের যন্ত্রপাতি এবং ১১ টি ডিজেল পাম্প স্থাপনের জন্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা প্রদান করে।

দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের বাণিজ্যিক খাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং নিকটতম অংশীদার। এক্ষেত্রে ১৯৭৩ সালে দু'দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা প্রতিবছর নবায়নযোগ্য। ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে প্রায় ১.১৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান অর্থের বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পাদিত হয়েছে।[5] অবশ্য বাংলাদেশ সবসময় দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করে চলছে। সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের একটি প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

সাল	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
বাংলাদেশে রপ্তানি	৩৪৫.৫৪	৩৩২.৯১	৪২০.১০	৪২৫.৩৫	৪৮৯.১৪
বাংলাদেশ থেকে আমদানি	২০.০৩	২৫.০২	৩২.৫৭	৪২.২৬	৪২.৫৪
বাণিজ্যিক ভারসাম্য (দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে)	(-) ৩২৫.৫১	(-) ৩০৭.৮৯	(-) ৩৮৭.৫৩	(-) ৩৮৩.০৯	(-) ৪৪৬.৬০

উৎস : KITA, South Korea

উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক হলো দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশ থেকে সাধারণত পাটজাত পণ্য, সোয়েটার, তৈরি পোশাক চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং হিমায়িত খাদ্য প্রভৃতি আমদানি করে। অপর দিকে বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়া থেকে অটোমোবাইল, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য, মেশিনারীজ, খুচরা যন্ত্রাংশ, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, তন্তু প্রভৃতি পণ্য আমদানি করে। উল্লিখিত পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি বাংলাদেশ গরম পোশাক, সোয়েটার, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জুতা, হিমায়িত খাদ্য, সিরামিক প্রভৃতি পণ্য বর্দ্ধিত পরিমানে রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স পণ্য, রং, পাটের তৈরি জুতা, গৃহস্থালী সামগ্রী, পোশাক, মোটা কাপড়, তন্তুজাত বা সিনথেটিক রশি প্রভৃতি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং এর ফলে বাংলাদেশের জনশক্তির বিপুল অংশের কর্মকান্ডের সুযোগ তৈরি হয়েছে।[6] সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায় যে, তৈরি পোশাক আমদানি করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে যার মধ্যে বাংলাদেশ থেকেই আমদানি

করেছে প্রায় ৩.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের পোশাক। ইতোমধ্যে কোরীয় সরকার বাংলাদেশ সরকারকে যুগোপযোগী এবং আন্তর্জাতিক গুনগত মানের আরো উন্নত পোশাক তৈরির জন্য অনুরোধ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশে তৈরি পণ্যের সংখ্যা ও চাহিদার পরিমান বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে কোরীয় ভোক্তাদের আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়াতে পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি ২০০৭ সালের ২৯ মে কোরিয়াতে এককভাবে একটি পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে। একইভাবে ২০০৭ সালের ২৯ জুন সিউলে কোরিয়ার আমদানিকারকগণ বাংলাদেশ থেকে কোরিয়াতে আমদানিকৃত পণ্যের একটি মেলার আয়োজন করে। এ মেলার ১০টি স্টলে এসব পণ্যের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়ায় বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হার ও পরিমানে বৃদ্ধি পায়। এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ থেকে আরো অধিক পরিমান ভোগ্যপণ্য রপ্তানির জন্য অনুরোধ করা হয় এবং একথা উল্লেখ করা হয় যে, যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাধা বা অসুবিধা রয়েছে তা যেন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে অতি দ্রুত সমাধান করা হয়। প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এসব প্রতিবন্ধকতা দ্রুত অবসানের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হয়। এর ফলে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে Asia Pacific Trade Agreement (APTA)-র অধীনে Least Developed Country (LDC)-ভূক্ত দেশের উৎপাদিত পণ্যের কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার প্রদান করে।

অন্যান্য এশীয় দেশের তুলনায় দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমান বিনিয়োগ সহায়তা প্রদান করে থাকে। দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা প্রদান করেছে এবং বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার একটি অত্যন্ত পছন্দনীয় বন্ধুদেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে কোরীয় সরকার এ পর্যন্ত KOICA ত্রাণ সহায়তা এবং EDCF বা Economic Development Co-Operation Fund-এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্য পরিমান ঋণ সহায়তা প্রদান করেছে। কোরিয়া সরকারের ধারণানুযায়ী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এখনও যেসব পশ্চাদপদতা রয়েছে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে তার পুরোপুরি আধুনিকীকায়ন করা সম্ভব। এ ধারণার ভিত্তিতে কোরিয়া বাংলাদেশে বিবিধ ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে যার ফলশ্রুতি হিসেবে ২০০০ সালে দক্ষিণ কোরিয়া জাতিসংঘে ঘোষণা প্রদান করে যে, বাংলাদেশ খুব শীঘ্রই Millennium Development Goals (MDGs) অর্জনে সক্ষম হবে।[7] পরবর্তীতে উরুগুয়ের এক গোলটেবিল বৈঠকে কোরীয়

প্রতিনিধিগণ এ মর্মে মত প্রকাশ করেন যে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা পালন করবেন যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো খুব দ্রুত উন্নতি লাভ করতে পারে। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রদান করে।[8]

প্রকৃতপক্ষে এসব কোরীয় সহযোগিতার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে কোরীয় উদ্যোক্তাদের আরো অধিক বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি এবং বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক অংশীদার বা পক্ষে রূপান্তর করা। বাংলাদেশের প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার এই সহযোগিতামূলক পররাষ্ট্রনীতির প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত অবস্থান। অধিকন্তু জাপানের উদীয়মান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বাজার ব্যবস্থাকে অধিক সুসংহত এবং শক্তিশালী করা এবং বংলাদেশী বাজারে কোরীয় গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব বৃদ্ধি করাও অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ত্রানসহায়তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৯৯১ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে Korea International Cooperation Agency (KOICA) গঠন করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর উভয় দেশের মধ্যে প্রায় ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পাদিত হয়েছে।[9]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকরন প্রক্রিয়ায় কোরিয়ার প্রায় ৭৪ টি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা বা Export Processing Zone (EPZ) রয়েছে, যার মধ্যে শুধুমাত্র শিল্প উৎপাদিত পণ্যই পরিচালনা করে ৬০টি ইউনিট।[10] এ ছাড়া কোরীয় সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ৩৬৬.৮৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব করে। এদিকে ২০০০ সালের মধ্যে কোরীয় বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে ২৯৩.৮২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে যার ফলে প্রায় ৬৫,২২৮ জন বাংলাদেশীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এসব কোরীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে ১৮২ জন বিদেশী নাগরিক কাজ করে।[11] আবার ব্যবসায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অনেক কোরীয় ব্যবসায়ী বাংলাদেশ সফর করেন এবং এদেশে অবস্থিত কোরীয় EPZ দেখার পর বিভিন্নভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা শুরু করেছেন। তবে তারা সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেন বস্ত্র এবং তৈরি পোশাকখাতে। এভাবে তথ্য ও

পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রতি কোরীয় সরকারের বিনিয়োগের চিত্র ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশে সহায়তার অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে কোরীয় রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা (KEPZ) স্থাপনের মাধ্যমে জুতা ও ব্যাগ তৈরির কারখানা স্থাপন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। এই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগকারীগণ ২০১০ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে।[12]

বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার মালিকানাধীন প্রথম **EPZ** বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরন এলাকা হলো ইয়াংগানে কর্পোরেশন। ১৯৯৫ সালের মে মাসে সিউলে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কোরীয় সরকারকে কোরিয়ার ইয়াংগানে কর্পোরেশনকে (Youngone Corporation) একটি কোরীয় **EPZ** স্থাপন করার অনুমতি প্রদান করেন। এরপর বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশের Board of Governors-এর অনুমোদনক্রমে Korean Export Proccessing Zone (KEPZ)-কে জমি বরাদ্দদানের অনুমতি প্রদান করা হয় এবং বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয় এ উদ্দেশ্যে ২৫২৬.১৯ একর (১০২২ হেক্টর) জমি বরাদ্দের জন্য অনুমতি দান করে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর প্রায় ২৪৯২.৩৫৭৩ একর জমি ইয়াংগানে কর্পোরেশন সংস্থাকে বরাদ্দ করা হয়।[13]

এরপর **EPZ** সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ইয়াংগানে কর্পোরেশনকে **EPZ-**এর অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। কোরীয় **EPZ** সংক্রান্ত আলোচনার ১০তম অধিবেশনে Board of Governors কোরীয় **EPZ-**এর উন্নয়নধারা পর্যালোচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে আহবান জানায়। অতপর উক্ত কমিটি কোরীয় **EPZ** সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদান এবং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে **EPZ** স্থাপনের জন্য অনুমতি দান করে। এরপর প্রস্তাবটি Board of Governors-এর ১১তম সভায় আলোচনা করা হয়। অতপর আরেকটি কমিটি গঠিত হয় যেখানে প্রধান সচিব পদে একজনকে নিয়োগ দান করা হয় যিনি **EPZ** সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণ ও পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই কমিটি কোরীয় EPZ-কে লাইসেন্স প্রদান করার সুপারিশ করে যাতে প্রতিষ্ঠানটি Foreign Direct Investment (FDI) বা সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ করতে পারে এবং এর ফলে বহির্বিশ্বে তাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। ২০০৬ সালের

অক্টোবর মাসে যখন ইয়াংগানে কর্পোরেশনের লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন এই পদক্ষেপটি আরো দ্রুত অগ্রগতির জন্য একটি প্রবিধান বা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রবিধানে বলা হয় যে, এই লাইসেন্স প্রদানের জন্য লাইসেন্স ফি বাবদ ১ লক্ষ মার্কিন ডলার এবং প্রতি একর জমির জন্য বার্ষিক ২০ ডলার এবং জামানত হিসেবে ১০,০০০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে, যদিও কোরীয় **EPZ** কর্তৃপক্ষ এই অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ কোরীয় **EPZ** সংক্রান্ত প্রবিধানে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ যেসব শর্তারোপ করে তার আগে থেকেই KEPZ আরো বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিল। এমতবস্থায় Broad of Governors-এর ১৪তম আলোচনা সভায় এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে প্রস্তাব করা হয় যে, Youngone Corporation যে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিল সেই নীতিমালা অনুযায়ী তারা তাদের **EPZ** পরিচালনা করবে।

বাংলাদেশের বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার (২০০১) আবহাওয়া সংক্রান্ত খাতে অধিক বিনিয়োগ করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে। অধিকন্তু এসময় বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে আরো আকর্ষনীয়, প্রতিযোগিতামূলক ও পেশাগতক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ সময় আরো প্রত্যাশা করা হয় যে, বাংলাদেশে কোরীয় EPZ স্থাপনের অনুমতি প্রদান করলে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আলোকে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। সাম্প্রতিককালে কোরীয় বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশের বিভিন্নখাতে আরো বেশি বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং এসব খাতের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হলো, জ্বালানী ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন, স্বল্প ব্যয়ে আবাসন নির্মাণ প্রকল্প, পাটকেলবোর্ড নির্মাণ,বস্ত্রও তৈরি পোশাক খাত, বোতলজাত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং আইসক্রিম প্রস্তুতখাত প্রভৃতি।[14]

বাংলাদেশের গ্যাস ও তেল উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অভ্যন্তরীন অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং তা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দারুনভাবে গতিশীল করেছে। তবে দেশের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন আরো অনেক গ্যাস এবং নতুন নতুন গ্যাসফিল্ড অনুসন্ধান করা ও গ্যাস উত্তোলন করা। বাংলাদেশের সমগ্র গ্যাস ক্ষেত্র ২৩ টি ব্লকে বিভক্ত এবং এসব ব্লক থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশী বিনিয়োকারীদেরকে বিনিয়োগ করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ১০টি তেল কোম্পানি ইতোমধ্যে বাংলাদেশের ১২টি ব্লকের তেল-গ্যাস উত্তোলনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং তারা প্রাথমিকভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় দফা তেল উৎপাদন শুরু করেছে। এ

কোম্পানিগুলোর মধ্যে ২টি কোম্পানির চুক্তি ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত ৪টি কোম্পানি ১০ টি ব্লকে তেল উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আছে। এগুলোর মধ্যে কেয়ার্ন এনার্জি কোম্পানির নাম প্রনিধানযোগ্য। কোম্পানিটি এখনো পর্যন্ত তার গ্যাস উত্তোলন কাজ অব্যাহত রেখেছে এবং তা ১৬ নং ব্লকে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডে নিয়োজিত আছে। ১৯৯৮ সাল থেকে এই কোম্পানি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গ্যাস উত্তোলন করে চলেছে। সাম্প্রতিককালে ১০৪ mmcf/d রেটে সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ২০০৫ সালে কেয়ার্ন এনার্জির সাথে বাংলাদেশের আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় উক্ত কোম্পানি ১৬ নং ব্লকের আওতাধীন হাতিয়া, মনপুরা এবং ম্যাগনামারা ব্লক থেকে গ্যাস উত্তোলন করবে।

শেভরন বা Chevron (Unical) মৌলভীবাজার ও বিবিয়ানায় যথাক্রমে ১২, ১৪ নং গ্যাস ব্লক আবিষ্কার করে। সফলভাবে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করার পর শেভরন কোম্পানি ২০০৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে মৌলভীবাজার এলাকার গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে। বর্তমানে এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের পরিমান ১০০ mmcf/d. ২০০৭ সালের মার্চ মাসে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়। বর্তমানে এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে প্রায় ২০০ mmcf/d পরিমান গ্যাস উত্তোলন করা হয়। অবশ্য শেভরন কোম্পানি জালালাবাদ গ্যাসক্ষেত্র থেকে বর্তমানে প্রায় ২০০ mmcf/d পরিমান গ্যাস উত্তোলন করেছে। আরেকটি গ্যাস উত্তোলনকারী কোম্পানি হলো তুলো (Tullow)। এ কোম্পানি ৯নং ব্লক ব্যাংগুরা-লালমাই (Bangora-Lalmai) গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস উত্তোলন কাজে নিয়োজিত আছে। এই গ্যাস কোম্পানি দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর ৬০ mmcf/d. গ্যাস উত্তোলন করে। অবশ্য দীর্ঘ মেয়াদী পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পরই কেবল তা সম্ভব হয়েছে। আবার ২০০৭ সালের মার্চ মাসে Total E & P Bangladesh Limited-নামক একটি কোম্পানি ১৭ ও ১৮ নং ব্লক থেকে ৬০% মালিকানার বিনিময়ে গ্যাস উত্তোলন শুরু করে। এ কোম্পানি পূর্বের তিনটি কোম্পানি, যথা-Tullow, Rexwood এবং Okland কোম্পানির মালিকানাস্বত্ব গ্রহণ করে। Total E & P Bangladesh Limited-কোম্পানিটি খুব নিকট ভবিষ্যতে এই ব্লক থেকে ৩ Dseismic গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার Ministry of Commerce Industry & Energy (MOCIE)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় Luxon Global Co. Ltd নামক কোরীয় তেল উত্তোলন কোম্পানি বাংলাদেশের তেল গ্যাস উত্তোলন খাতে ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করার আগ্রহ প্রকাশ করে। এ উদ্দেশ্যে

প্রজাতন্ত্রী কোরিয়ার জ্বালানী শক্তিমন্ত্রণালয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ২০০৬ সালের ১৬ ই সেপ্টেম্বর ঢাকা সফর করেন। এর পর ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা "The Consortium" নামে পরিচিত।[15] ৩ বছর মেয়াদী এ চুক্তিতে Korea Resource Corporation (KORES) এবং Electric Power Corporation (KEPCO) সরকারিভাবে এবং POSCO, Luxon Global Co বেসরকারিভাবে বাংলাদেশের তেল অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্প, বাণিজ্য ও জ্বালানীশক্তি মন্ত্রণালয় এ চুক্তি সম্পাদন ও কার্যকর করার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করে। এতে বলা হয় যে, KOCOL, KNOC, KOGAM কোম্পানিগুলো সরকারি খাতে উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। এ চুক্তির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে এ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং কোরিয়ার জ্বালানীশক্তি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক তেল, গ্যাস ও শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২০ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুত পৌছে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে যা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিদ্যুত ঘাটতি একটা বিরাট সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই ঘাটতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারিভাবে স্বল্পমেয়াদী, মধ্য মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া সরকার বাংলাদেশকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। এই প্রকল্পের আওতায় ২০০৬ সালের জুন মাসে দক্ষিণ কোরিয়া খুলনাতে Greater Khulna Power Distribution Project সফলভাবে স্থাপন করেছে এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে Intensification and Expansion of Distribution System (2nd phase) নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়া ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে আরো বেশি সহায়তা করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এক বছর মেয়াদী এ প্রকল্পটি সফলভাবে সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের উল্লে-খযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে বলে বিশেষজ্ঞরা আশা প্রকাশ করেন।[16]

কৃষি ক্ষেত্রেও দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে সহায়তা করে আসছে। দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে

বাংলাদেশের কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা, কৃষি খামার স্থাপনসহ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার জন্য কৃষকদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া আরো কতিপয় ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতা দান করে থাকে।[17] এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষি বীজ ও সার সংরক্ষনের জন্য সারা বাংলাদেশে অসংখ্য গুদামঘর নির্মাণ। দক্ষিণ কোরিয়া উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ধান (উচ্চ ফলনশীল ধান), সয়াবিন,শাকসবজি এবং ফলমূল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এসব ফসলের যেমন- ধান,সয়াবিন, শাকসবজি এবং ফলমূল প্রভৃতি বীজ সংগ্রহের জন্য কোরিয়া সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় এবং দক্ষিণ কোরিয়া প্রশাসন তা সরবরাহ করতে তাৎক্ষনিক সাড়া দান করে। দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সংগৃহীত এসব বীজ সংরক্ষণের ফলে বাংলাদেশের শস্যবীজ ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।[18]

দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নতমানের কৃষিকাজ ও কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে বিদেশী নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা অধিক জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মিটাতে দক্ষিণ কোরিয়া অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিফার্ম ব্যবস্থাপনার যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ উন্নত বীজ বপনের মাধ্যমে কিভাবে আরো অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় সে সম্বন্ধে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কোরিয়া সরকারের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করেছে।[১৯] ধান উৎপাদন ও চাষের ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এক্ষেত্রে কোরীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় কৃষিবিদদের প্রশিক্ষণদান বাংলাদেশকে আরো বেশি লাভজনক ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের উন্নত জাতিগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ইতোমধ্যে Biotechnology বিষয়ের ওপর গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে আবেদন করা হয় যে, কোরিয়া যদি Biotechnolog খাতে উচ্চ পর্যায়ে বাংলাদেশী গবেষকও বিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাহলে দেশটির গবেষক ও বিজ্ঞানীরা আরো অধিক দক্ষতা সম্পন্ন ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে। এজন্য বাংলাদেশ কোরিয়া সরকারের কাছে গবেষণাগারে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় পণ্য প্রদানের জন্য আবেদন জানিয়েছে। বাংলাদেশের বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকগণ স্বল্প মেয়াদী শিক্ষা সফরের মাধ্যমে কোরীয় কৃষি ব্যবস্থা তথা অধিক উৎপাদনশীল ধান চাষ পদ্ধতি, শাকসবজির বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরন, কৃষি খামারের ব্যবস্থাপনা, ফল

প্রক্রিয়াজাতকরন এবং শস্য মাড়াই ও সংরক্ষণের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন যা বাংলাদেশের কৃষি খাতকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।[২০]

১৯৭৯ সালের ১৪ জুন প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুব উন্নয়ন এবং খেলাধুলা, পর্যটন, প্রেস, রেডিও, টেলিভিশন এবং যোগাযোগ খাতে সহযোগিতা দান করতে প্রতিশ্রুতি দান করে। এ চুক্তি সম্পাদনের দীর্ঘদিন পর অর্থাৎ ২০০৩ সালের ২৯ এপ্রিল দুই দেশের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার আওতায় ২০০৩ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থীও গবেষক বিনিময় প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীকালে এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের কোরিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন, আমলা প্রশিক্ষণসহ বিশেষ ধরণের কৌশলগত প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হয়েছে।[21]

যুব সমাজকে নৈতিকভাবে অধ:পতন থেকে রক্ষা করা এবং কারিগরি জ্ঞান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা যথা, স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশীপের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া ফুটবল, হকি, এথলেটিক্স, টেবিলটেনি্স, ব্যাডমিন্টন, জিমন্যাস্টিক, জুডো ও বক্সিং প্রভৃতি খেলাধুলার জন্য অর্থ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশী খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদদেরকে আরো দক্ষ করে তুলতে সহযোগিতা দান করেছে। অধিকন্তু বাংলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ২০০৮ সালের ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশের অলিম্পিক সমিতি (Bangladersh Olympic Association) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অলিম্পিক কমিটির (Korean Olympic Committee) মধ্যে একটি সহায়তামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির আলোকে দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্ব অলিম্পিকে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সহায়তা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।[22] বাংলাদেশের যুবসমাজের মধ্যে নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রক্রিয়া ও কোরিয়ার পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দান করা হয়।

বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ১৯৯৫ সালের ২৬ মে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া

একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, দু'দেশের দু'জন প্রতিনিধি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করবেন।[23] এই চুক্তির ৪নং অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিশন গঠন করা হবে এবং এ কমিটির সদস্যরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিনিধিদল অনেক আলাপ-আলোচনার পর এ সম্পর্কে একটি রূপকাঠামো তৈরি করে যা ১৯৯৬ সালের ২৫ এপ্রিল কোরিয়া সরকার অনুমোদন করে। কিন্তু পরবর্তীতে এই কমিটি এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সভার আয়োজন করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ বাস্তবায়িত হয়নি। তবে কোরিয়া সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের (Ministry of Foreign Affairs (MOFA) মাধ্যমে প্রশাসন বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে বেশ কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং বিভিন্নমূখী সহায়তা প্রদান শুরু করে। এসব সহায়তার মধ্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রের বিভিন্ন সেক্টরে সৃজনশীল ও উদ্ভবনী ধাঁচের গবেষণা, বিজ্ঞানী বিনিময় এবং কারিগরি সহায়তা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[24] এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আলোচনার আহবান জানানো হলে কোরিয়া সরকার সাড়া প্রদান করে এবং কোরিয়া সরকার ১৯৯৮ সালের ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশে অবস্থিত কোরীয় দূতাবাসের মাধ্যমে দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করে। এ দু'টি প্রকল্প হলোঃ Bangladesh Scientific and Technical Documentation Centre (BANSDOC)-এর তত্ত্বাবধানে তথ্য ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান কর্মসূচি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা; এবং দ্বিতীয়তঃ Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research (BCSIR)-এর তত্ত্বাবধানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন এবং তার গুনাগুন অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অন্যতম ক্ষেত্র হলো উভয়দেশের মধ্যে বিমান চলাচলের সহযোগিতা। ১৯৭৮ সালের ১ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা হয় এবং এর ভিত্তিতে ১৯৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি AIR Service Agreement (ASA) স্বাক্ষরিত হয় যা ১৯৭৯ সালের ১২ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। এ চুক্তির আলোকে দু'দেশের মধ্যে অবাধ ও নির্বিঘ্নে বেসামরিক বিমান চলাচলের সূচনা করা হয়।[25] অবশ্য অবাধে বিমান চলাচল করলেও কতিপয় ক্ষেত্রে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং ১৯৭৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে একটি

Memorandum of Understanding বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির এক পর্যায়ে বলা হয় যে,- "….the capacity of aircraft to be provided at the outset either was shall be agreed between the two governments before the agreed services are inaugurated. Thereafter, the designated airlines of the two Governments shall determine the capacity by direct negotiation which shall, however, be subject to approval by the aeronautical authorities of the two Governments."[26] উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর বাংলাদেশ সরকার Biman-Bangladesh Airlines (BG) নামকরন করে আকাশে উড্ডয়ন করে, যদিও কোরিয়া সরকার বাংলাদেশ অভিমূখে পরিচালিত তাদের বিমানের বিশেষ কোন নামকরন করেনি। স্বাক্ষরিত Air Service Agreement (ASA)-এর শর্তানুসারে দুই দেশের বিমানই Rute Anne of ASA পথে চলাচল করে এবং পঞ্চম অবাধ পরিবহন অধিকার নীতিমালা অনুসারে কেবলমাত্র Intermediate এবং Beyond points এর ৩/৪ রুটে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারবে। তবে পঞ্চম অবাধ পরিবহন অধিকার ছাড়া এর বাইরের পথ দিয়ে বিমান স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারবে না, যার ফলে পরবর্তীতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশ দু'টি তাদের বিমানের নামকরণ করতে রাজী হয়। বাংলাদেশ বিমান এ পথ ধরেই সিউলের দিকে গমন করে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ASA চুক্তি অনুসারে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের উচিত বাংলাদেশে আগত তাদের বিমানের নামকরণ করা এবং ১৯৮৯ সালের সমঝোতা স্মারককে যথাযতভাবে বাস্তবায়ন করা।

পর্যটন ক্ষেত্রেও বাংলাদেশও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের উন্নয়নে সবচেয়ে বড় অংশীদারী দেশ। বিশেষ করে, দেশটি বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নির্মাণ শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সহযোগিতা করে থাকে। তবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আলোকে দেশ দু'টি একে অপর দেশের পর্যটন শিল্প সম্পর্কে প্রচার, জ্ঞানার্জন ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত আদান-প্রদান করে। কোরিয়া সরকার Korean International Cooperation Agency (KOICA) এবং Asian Productivity Organization (APO)-কে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য আহবান করেছে এবং উপরোক্ত সংস্থা দু'টি তা গ্রহণ করেছে। এভাবে কোরিয়া সরকারের ব্যাপক

প্রচারাভিযান ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উত্তরোত্তর বিকাশ ও সমৃদ্ধি লাভ করে চলেছে।

বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যুষিত দেশগুলোতে বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শনের মাধ্যমে Buddhist Circuit Tourism ব্যাপক উন্নতি লাভ করতে পারে। বিশেষ করে কোরিয়া, জাপান, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন শিল্পের চরম বিকাশ সাধিত হয়েছে। এসব দেশের মত বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির, বিহার ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি অধ্যুষিত পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে মহেশখালীতে বৌদ্ধ কবরস্থান, রাঙামাটিতে বৌদ্ধ মন্দির, অষ্টম শতকে নির্মিত পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে নির্মিত ময়নামতি বৌদ্ধ বিহার এবং ঢাকার কমলাপুরের বৌদ্ধ মন্দিরের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব বৌদ্ধ মন্দিরকে যথাযথ আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সংরক্ষন করার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে বৌদ্ধ পর্যটন শিল্প যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম রাজকীয় ধর্মের মর্যাদা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে তা বর্তমান অবধি বাংলাদেশের মানুষের কাছে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তবে এই ধর্মটি সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করেছে বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত পাহাড়ী এলাকার উপজাতীয় মানুষের মধ্যে এবং তা আজও এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির অনিবার্য অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় সাম্প্রতিকালে বাংলাদেশে অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে যা পর্যটকদের নিকট খুবই চমকপ্রদ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার পর্যটন দপ্তর ও বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলো এদেশের বৌদ্ধধর্মীয় পীঠস্থানগুলোর মেরামত সংরক্ষন ও আধুনিক পদ্ধতিতে প্রদর্শনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ বাবদ কোরিয়া সরকার গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা দান করেছে। এক্ষেত্রে কোরিয়া সরকার বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে এবং কোরীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশীদের কোরীয় পর্যটন শিল্পের আদলে পর্যটন শিল্পের প্রচারাভিযান, পর্যটন ব্যবস্থাপনা, হোটেল ব্যবস্থাপনা এবং খাদ্য ও পানীয় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। এভাবে কোরীয় সহযোগিতায় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প আরো সমৃদ্ধও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া ঘরোয়াভাবে পর্যটন শিল্পের আদলে সফর বিনিময় করে থাকে। এর

ফলে পেশাগত পর্যটন ও এমন সব বিষয়ে উভয় দেশে লেখকদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে যারা তাদের লেখনি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দুই দেশের পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হবে। এভাবে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া পর্যটন শিল্প বিকাশ লাভের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রজাতন্ত্রী কোরিয়া সরকারি এবং বেসরকারিভাবে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও পরিচালনার জন্য টুরিস্ট গাইড হিসেবে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিয়োগ করাকে উৎসাহিত করেছে। বাংলাদেশের অনিন্দ্য সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৈচিত্র্যময় আদিবাসী জীবনধারা, বিশ্ববিখ্যাত অরণ্য সুন্দরবন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত-কক্সবাজার, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, যেমন-নওগাঁর পাহাড়পুরে অবস্থিত অষ্টম শতকে নির্মিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার, কুমিল্লার ময়নামতিতে অবস্থিত শালবন বিহার এবং পটুয়াখালির নৈসর্গিক দৃশ্য ও সেখানে বৌদ্ধদের বসবাস ও অবস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলো কোরীয় পর্যটকদের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। এসব অবস্থানগুলোর জন্য প্রচারনা ও আলোকপাত করার পদ্ধতি কোরীয় কর্মকর্তারা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ দান করে থাকেন। পর্যটন শিল্পের এই বিকাশ বাংলাদেশের আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করবে এবং বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

২০০৪ সালে বাংলাদেশের National Academy for Educational Management (NAEM)-এর দু'জন ফ্যাকাল্টি সদস্য Korean Development Institute (KDI)-এর অধীনে পরিচালিত ডিগ্রী প্রদান কোর্সের পাঠ্যক্রম সফলতার সাথে শেষ করে Master of Public Policy (MPP) ডিগ্রী লাভ করেছেন। তারা KOICA-র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করেছেন। উচ্চ শিক্ষার দ্রুত প্রসারের জন্য বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ফেলোশীপ, স্কলারশীপ এবং বৃত্তি প্রদান করা শুরু করেছে এবং সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্র কোরিয়াতে ভর্তির পর এদেশের নম্বর, গ্রেড তথা তার ক্রেডিট ট্রান্সফার করতে পারবে কিনা, কিংবা একইভাবে কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্রদেরকে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার সুযোগ দেয়া যায় কিনা তা দু'দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে ইতোমধ্যে তালিকাভূক্তি করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এসব বিনিময় ও ট্রান্সফার সম্ভব হলে দু'দেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে এবং তা দু'দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও উচ্চ শিক্ষা প্রসারে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সহায়ক হবে।[27]

পরিশেষে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোরিয়ার বিভিন্ন NGO Basic Human Needs (BHN) বা মৌলিক মানবিক প্রয়োজন-এর আলোকে নারী অধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা দান করে থাকে।[28] কোরীয় সরকার বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই উন্নয়নমূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।[29] অনুরূপভাবে বাংলাদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেশটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশী NGO-এর সহায়তা গ্রহণ করেছে। এসব NGO-র মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো Wrold Vision, Good Neighbors International, KDAB, BRAC, ASA, Grameen Bank প্রভৃতি।[30] এসব NGO-এর সহায়তায় কোরীয় সরকার বাংলাদেশের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেসব কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নারীদেরকে সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা, নারী নির্যাতন ও নিপীড়ন বন্ধ করা এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।[31] এছাড়াও দেশটি নারীদেরকে ক্ষুদ্র ঋণদানকর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরনসহ সমাজ সচেতনতা সম্বন্ধে জাগ্রত করার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছ। বলা যায়, নারী-পুরুষের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরনার্থে কোরীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।[32] এভাবে KOICA-র সহায়তায় বাংলাদেশের নারী সমাজের একটি বড় অংশ ক্রমশ: তাদের অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে উঠেছে এবং মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

তথ্য নির্দেশ:

১. Sang Tae-Kim (2004),"Promoting International Cooperation Through International Training Programs", KOICA, July,(2004).

২. (PDF)List of Agreement-Ministry of Foreign Affairs. (www.mofa.gov.bd/list.pdf).

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

৫. Embassy of People's Republic of Bangladesh, Seoul.

৬. Ross V. Avincula (2000),"Foreign Direct Investments, Competitiveness, and Industrial Upgrading: The Case of the

Republic of Korea," Masters of International Economics Thesis,KDI,2000.

৭. Chang Jae Lee, (Vice President KIEP),"Korea's Experience in Development Cooperation." p.70.

৮. "Bangladesh has 180 Million People, Offers Good Business Opportunities," Interview of Chairman Kim Hyung-Chul of P&S International(ROK) with *The Korea Post*, March 2007, p.31

৯. South Korean Ministry of Foreign Affairs and Trade about relations with Bangladesh.

১০. Helal Uddin Ahmed, æEPZs of Bangladesh :Promises Galore” in *The Korea Post*, Vol.20, No.3, March 2007, p.L-6.v

১১. প্রাগুক্ত.P.L7.

১২. প্রাগুক্ত.P.L7.

http:// www. businessnews-bd. com/index .php? option=com_ content & ......

১৩. প্রাগুক্ত P.L7

১৪. "Korea May Import More from Bangladesh to Improve Balance"- Interview of His Excellency Mr. Mustafa Kamal, the Honorable Ambassador of Bangladesh to Seoul with *The Korea post*, March 2007.

১৫. (PDF) List of Agreement-Ministry of Foreign Affairs. (www.mofa.gov.bd/list.pdf).

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. Kabir,"Korea Overseas Volunteers (KOV) Program in Bangladesh," p.65.

১৮. প্রাগুক্ত.

১৯. প্রাগুক্ত.

২০. Sang-Tae Kim, *ODA Policy of ROK*,p.26.

২১. Sang-Tae Kim, "Promoting International Cooperation Through International Training Programs," (KOICA, July 2004)

২২. (PDF)List of Agreement-Ministry of Foreign Affairs. (www.mofa.gov.bd/list.pdf).

২৩. Sang-Tae Kim,"Cooperation for Agricultural Development between Korea and Indochina,"p.5.

২৪. Bangladesh Computer Council, Ministry of Science and Information & Communication Technology, "Souvenir, Inauguration: BCC Bhaban & BKIICT," July28,2005. pp.24-25

২৫. (PDF)List of Agreement-Ministry of Foreign Affairs. (www.mofa.gov.bd/list.pdf).

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. http:// www. student visa 4 u.com/indian-universities/765.

২৮. KOICA'S NGO activities explained in this section are restated from KOICA," Co-operation for a Better World", October,1997.

২৯. *The Korea Times*, "Time for Korea to lend Helping Hand KOICA Head", November,1999.

৩০. Hamid Ali Khan, "Women empowerment: A Priority Endeavor in Bangladesh" in *The Korea Post*, March 2007.

৩১. প্রাগুক্ত.

৩২. প্রাগুক্ত.

গ্রন্থপঞ্জী

সরকারি উৎস

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র, ১৫ খন্ডে সন্নিবেশিত, হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, (ঢাকাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয় প্রকাশিত, ১৯৮২-৮৫)। বার্ষিক আমদানি ব্যয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। বার্ষিক রপ্তানি আয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ বাণিজ্য-রপ্তানি রীতিনীতি ও কলাকৌশল, বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা, (বিভিন্ন বছরের)।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য

Statistical Yearbook of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics Division, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh. *Annual Export Receipts*, Statistics Department, Bangladesh Bank. Import Payment by Countries/Territories and Commodities, Statistical Department, Bangladesh Bank. Rural Development in South Korea: Tour Report or The BARD Team that visited South Korea. Bangladesh Computer Council, Ministry of Science and Information & Communication Technology, "Souvenir, Inauguration: BCC Bhaban & BKIICT. বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া মৈত্রী সমিতির প্রতিবেদন এবং কোরিয়া ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সুভ্যিনিয়র ও প্রতিবেদন।

প্রাথমিক উৎস

1.KOICA Reports.
2.Pacts Between Bangladesh and Korean Government.
3.Korea Exim Bank, “Reports on EDCF Loans (yearly).”
4. Memorandum of Understanding.(বিভিন্ন ক্ষেত্রে)
5. Bangladesh EPZ Reports.
6.Bangladesh Board of Investment বা BOI প্রতিবেদন।
7.Korea Development Institute Papers.
8.Bank of Korea Reports.
9. Korean Ministry of Foreign Affairs Paper.
10. Bangladesh Bank Reports.
11. Bangladesh Economic Relations Department (ERD)Papers.

দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী, " বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্ক, ১৯৭১-১৯৮১"(পি.এইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

মোছাঃ রুনালাইলা, "চীনের প্রতি রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান প্রশাসনের নীতি, ১৯৪৩-৪৮ঃ ধারণা ও বাস্তবায়ন"(পি.এইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,২০০৮)।

এ.কে.এম. জসিম উদ্দীন, "বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৮১),"(এম.ফিল.থিসিস.জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২)।

প্রবন্ধ ও গ্রন্থ (ইংরেজি)

Administration Office, Masan Free Export Zone (2002) *The Status of Masan Export Free Zone* (in Korean)..

Aggarwal, Aradhana (2006) 'Special Economic Zones: Revisiting the Policy Debate', *Economic and Political Weekly*,vol.41, No.43 and 44, pp.4533-4536.

Ahmed, Helal Uddin, æEPZs of Bangladesh: Promises Galore", in *The Korea Post*, Vol.20, No.3, March 2007.

Asia Monitor Resource Center (1998) *We in the Zone: Women Workers in Asia's Export Processing Zones*, Asia Monitor Resource Center, Hongkong.

Bhattacharya, Debapriya (1998) *Export Processing Zones in Bangladesh: Economic Impact and Social Issues*, Working Paper No.80, International Labour Office, Geneva.

Boyenge, Jean-Pierre Singa (2007) *ILO Database on Export Processing Zones* (Revised), International Labour Office, Geneva.

Cho, Mijin (1994) *A Study on the Reaction of Women's Labour Movement against Foreign Capital Pull-out in Masan Free Export Zone*, Master's thesis in Gender Studies, Ewha Woman's University (in Korean)…

Currie, Jean (1979) *Investment: The Growing Role of Export Processing Zones*, The Economic Intelligence Unit, London.

Chun Seung-hun (2007), "Sharing Korean Experience for International Development" in *Proceeding of the ODA International Conference*, March 7, 2007, organized by KOICA at the Lotte Hotel Crystel Ballroom., Seoul

Chun Seung-hun (2007), "Sharing Korean Experience for International Development" in, KOICA,(2007), *Proceeding of the ODA International Conference*, (Seoul: KOICA).

Chung, Rae-Kwon, æKorea's ODA Policy Direction", (Internet websites on Korean ODA).

KOICA, (2007) æCountry Program on Bangladesh."

Cumings, Bruce (1981) *The Origins of the Korean: Liberation and the Emergence of Separate Regimes*,1945-1947(Princeton: Princeton University Press), and ……..(1990)…….*Origins of the Korean War*. Vol.2 *The Roaring of the Cataract*, 1947-1950(Princeton: Princeton University Press)…..(1984) The Origins and Development of North East Asia's Political Economy" in *International Organization*(38), Winter 1984.

Dowla, Asif (1997) æExport Processing Zones in Bangladesh: The Economic Impact", *Asian Survey*, Vol.37, No.6.

Dent, Christopher M. (2002), *The Foreign Economic Policies of Singapore, South Korea and Taiwan* (Northampton, Mass: Edger Allen, 2002).

Edgren, Gus (1984) 'Spearheads of Industrialisaion or Sweatshops in the Sun? in Lee, Eddy ed., Export Processing Zones and Industrial Employment in Asia, ILO, Asian Employment Programme (ARTEP), Bangkok.

Eckert, Carter J.K.I-biak Lee, Young lek Lew, Michael Rabinson and Edward W. Wagner (1990), *Korea: Old and New* (Seoul: Ilchokak)

Gopalakrishnan, Shankar (2007) ' Negative Aspects of Special Economic Zones in China,' *Economic And Political Weekly*, Vol.42, no.17, pp.1492-1494.

Gunter, Bernhard G., and Rolph van der Hoeven.(2004). The Social Dimension of Globalization: A Review of the Literature,' International Labour Review, Vol.143, No.1-2.

Hans, Morgenthau (1962), æA Political Theory of Foreign Aid" in *American Political Science Review*, Vol.56.

ILO (1998a) *Labour and Social Issues Relating to Export Processing Zones,* ILO, Geneva.

ILO (2003) *Employment and Social Policy in Respect of Export Processing Zones,* ILO, Geneva.

Jayanthakumaran, Kankesu(2003) æBenefit-Cost Appraisals of Export Processing Zones: A Survey of the Literature," *Development Policy Review*, Vol,21, No,1, pp.51-65.

Jay.K. and C. Michaopolous (1989), æDonor Interests, and Aid Effectiveness" in A.Krueger and V.Ruttan (eds), *Aid and Development* (Baltimore: John Hopkins),

Kabir, Khairul, æKorea Overseas Volunteers (KOV) Program in Bangladesh," In *The Proceed Nineth Consultation Meeting On the Korea Overseas Volunteers Program* (Seoul: KOICA,2006)

Kabeer, Nila and Simeen Mahmud (2004) æGlobalization, Gender and Poverty Bangladeshi Women Workers in Export and Local Markets," *Journal of International Development*, Vol.16, No 1, pp.93-109.

Khan, Hamid Ali, æWomen Empowerment: A Priority Endeavor in Bangladesh", in *The Korea Post*, March 2007.

Kim, Sang-Tae (2003), *ODA Policy of the Republic of Korea: In the Context of Its Evolving Diplomatic and Economic Policies* (Seoul: KOICA).

……….. æCooperation for Agricultural Development between Korea and Indochina," International Cooperation and Assistance Program of Korea International Cooperation Agency In International Symposium held on September 9, 2005 (arranged by KOICA in Hanoi, Vietnam).

………(2006). æDevelopment Cooperation Strategy of KOICA and the KOV Program ," in *The 9th Consultation Meeting on the Korea Overseas Volunteers Program: Effective ways to align the KOV program with development strategies* (Seoul: KOICA).

………… (2003), *ODA Policy of the Republic of Korea: In the Context of Its Evolving Diplomatic and Economic Policies* (Seoul: KOICA).

Kim,S.Y. and W.S. Kim, (1992), *Korea's Development Assistance: Performance, Prospects and Policy* (Seoul: International Trade and Business Institute, International Center for Economic Growth).,1992).

……………(2003), æFuture Tasks to Upgrade Korea's ODA" (Seoul: KOICA).

Kwon, Okyo Deputy Prime Minister and Minister of Finance and Economy, in EDCF, *Annual Report,*2006

Kyoon, Yoon, Suk, æTrade Diplomacy, and Humanitarism: Three Major Factors Influencing KOICA's Aid to Developing Countries," Master of International Relations Thesis, Department of International Relations, School of Public Policy & Management, KDI, 1999

Lee., Chae, Jin, æSouth Korean Foreign Relations Face the Globalization Challenges," In Kim, Samuel S., ed., *Korea's Globalization* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

Lee, Changwon (2005) æDevelopment of Free Economic Zones and Labour Standard: A Case Study of Free Economic Zones in Korea" Cornel University ILR School *International Programs Visiting Fellow Working Papers*.

Lee, Eddy (1984) æIntroduction" in Lee, Eddy ed., *Export Processing Zones and Industrial Employment in Asia*, ILO, Asian Employment Programme (ARTEP), Bangkok.

Lim, Linda Y.C. (1984) æLabour and Employment Issues in Export processing Zones in Developing Countries," In Lee, Eddy ed., *Export Processing Zones and Industrial Employment in Asia*, ILO, Asian Employment Programme (ARTEP), Bangkok.

Lee, Sang Eun (2003), æThe Role of Korea's ODA: Bridging the Digital Divide in Developing Countries," Unpublished Thesis, Master of International Studies, GSIS, Ewha Woman's University.

Madani, Dorsati (1999), *A Review of the Role an Impact of Export Processing Zones*, Policy Reseach Working Paper, The World Bank.

Mazumder, Indrani (2001) æEPZs and Their Workers in India: A Study of the Noida Export Processing Zone," in Oberai, A.S., A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam eds., *Labour Issues in Export Processing Zones in South Asia: Role of Social Dialogue*, ILO, New Delhi.

Michaopolos, K.Jay and C., (1989), æDonor Policies, Donor Interests, and Aid Effectiveness," in Krueger, C.And V. Ruttan, Eds., *Aid and Development* (Baltimore: John Hopkins).

Ministry of Foreign Affairs and Trade, ROK, *Korea's Official Development and Assistance* (Seoul: MOFAT, 2000).

Ministry of Foreign Affairs and Trade, ROK, *Korea's Official Development and Assistance (*Seoul: Ministry of Foreign Affairs, ROK,1997).

Murayama,Mayumi(2008) æFemale Garment Workers in India and Bangladesh in the Post-MFA Era" in Sato, Hiroshi and Maumi Murayama eds., Globalisation, *Employment and Mobility: The South Asian Experience*, (Palgrave Macmillan, Basingstoke).

Message from Cheon-Sik Yang, Chairman and President of The Export-Import Bank of Korea, In EDCF Annual Report, 2006.

Ministry of Finance and Economy and The Export-Import Bank of Korea (2001), *EDCF: Annual Report,* (Seoul: MFE and EXIM Bank)…

Ministry of Finance and Economy and The Export-Import Bank of Korea(2006), *Economic Development Cooperation Fund: Annual Report,*2006 (Seoul: MFE and the EXIM Bank),pp.20-21.

Ministry of Finance and Economy and The Export Import Bank For Korea (2007), *Guide to Economic Development Cooperation Fund*, Korea (Seoul: EDCF).

Ministry of Finance and Economy and The Export Import Bank for Korea (2005), *Economic Development Cooperation Fund*, (Seoul: MFE and EXIM Bank) pp.25-2.

Ministry of Finance and Economy and The Export Import Bank of Korea (2004), *EDCF: Annual Report* (Seoul: MFE and The Exim Bank).

Ministry of Finance and Economy and The Export Import Bank of Korea (2002), *EDCF: Annual Report* (Seoul: MFE and The Exim Bank).

Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea (2000), *Korea's ODA* (Seoul: Ministry of Foreign Affairs and Trade).

Morgenthau, Hans, æA Political Theory Of Foreign Aid," in *American Political Science Review*, Vol.56 (1962).

Neetha N. and Uday Kumar Varma (2004) *Labour , Employment and Gender Issues in EPZs: The Case of NEPZ*,(Nodia: V.V. Giri National Labour Institute).

Quddus, Munir and Salim Rahid (2000) *Enterpreneurs and Economic Development : The Remarkable Store of Garment Exports from Bangladesh*, (Dhaka:The University Press).

Rahman, A.F.M. Shamsur, æUnited Sates Economic and Military Assistance Policy Toward China During World War Π and Its Immediate Aftermath" Ph.D Dissertation, Dept. of History, University of Kansas, USA,1988.

……….(2008), æ*Korean Assistance to Structural Development in Bangladesh Since 1991: An Analysis"*, L.G Convention Hall, International Education Building, Ewha Womans University, Korea.

………….(2008), South Korean Economic and Technological Assistance Policy toward Developing Countries of East, South East and South Asian Countries and Asian Integration: Bangladesh:A Case Study, (M-add Seoul, Korea).

Rhee, Yung Whee (1990) 'The Catalyst Model of Development: Lessons from Bangladesh's Success with Garment Exports,' *World Development*, Vol.18, No.2, pp.333-346.

Rondinelli, Denis A. (1987) æExport Processing Zones and Economic Development in Asia: A Review and Reassessment of Means of Promoting Growth and Jobs," *American Journal of Economics and Sociology*, Vol,46, No.1, pp.89-105.

Shoesmith, Dennis. Ed., (1986): *Export Processing Zones in Five Countries: The Economic and Human Consequence*, Asia Partnership for Human Development, Hong Kong.

Shim,Yoon-Sun July (2000), æKorea's Official Development Assistance: Trends and Strategies with an Emphasis on Assistance to Vietnam," Unpublished Masters thesis, Graduate School of International Studies, Yonsei University, Seoul Korea.

Sobhan, Rehman,(1982) *The Crisis of External Dependence: The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh* (Dhaka: TheUniversity Press).

Tipton F.B. (2002), æBridging the Digital Divide in Southeast Asia: ilot agencies and Policy Implementation in Thailand, Malaysia, Vietnam, and Philippines." In ASEAN *Economic Bulletin*, 19(1)

Wong, Kwan-Yiu and David K.Y.Chu (1984) æExport Processing Zones and Special Economic Zones as Generators of Economic Development: The Asian Experince" *Geografiska Annaler*,66 B, pp.1-16.
Wrold Bank (1992)*Export Processing Zones*,(Washington D.C: Industry Development Division and Trade Policy Division).
World Bank(1990) *World Bank Report* 1990 (New York: Oxford University Press)
Yanagihara,Toru, æJapan's Foreign Aid to Bangladesh: Challenging the dependency Syndrome?" in Koppel, Bruce M. and Robert M. Orr, Jr., eds., 1993. *Japan's Foreign Aid: Power and Policy in New Era* (Boulder: Westview).

KOICA Reports and Country Programs

KOICA, 2006: *International Training Program*,2006
KOICA, (1997) *Koreans in the Global Village-Korean NGOs' Foreign Aid Activities*.
KOICA,1997, *Annual Report*, 1996, p.46.
Korea International Cooperation Agency (KOICA),2006.
KOICA, Statistics, 1991-2005.
KOICA, Statistics,2006.
KOICA,1997, *Annual Report* 1996.
KOICA,,1999,Plan for Grants Aid Projects in 1999.
www.koica.or.kr/data/stat/homepage 98.xls,97 xls (Oct.25,1999).
KOICA, *Annual Report*, 1993b
KOICA, Country Program-Bangladesh,2007.
KOICA, *Annual Report*, 1998
Korea International Cooperation Agency, KOICA, *Annual Report*, 1998
KOICA, *International Training Program* 2006,p.25
KOICA,1998, æKOICA's Report to the Committee Unification, Diplomacy and Trade in the 198th National Assembly Session in 1999".
KOICA: Country Program-Bangladesh,2007.
KOICA: Country Program-Bangladesh,2007
KOICA: Country Program-Bangladesh,2007

BOESL Reports

News Papers

Korea Herald.

The Daily Star.

The Financial Express, Home Page, Dhaka Monday July, 20,2009.

The Bangladesh Observer.

The Morning News.

The Bangladesh Times.

The Dong-A Ilbo, October24,2006.

The Korea Times, March 8,2007

The Korea Times, March 8, 2007.

The Korea Times, March 8, 2007.

Journal

Korea Focus,

Asian Affairs,

Beijing Review

BIISS Journal,

Banglapidia,

Dhaka Courier

Far Eastern Economic Review

Foreign Affairs

History Today

Holyday

International Affairs

News Week

The Journal of Asian Studies

The Korea Post

KOICA Records

1. Record of discussions (RD) between the implementation survey team of the Republic of Korea and the Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS) of ministry of Education of the People's Republic of Bangladesh on the Project for the Establishment of Bangladesh-Korea Institute of Information and Communication Technology, May 4, 2006, also, *KOICA Report*, 2006 and 2007, and Country Program for Bangladesh.

2. Record of Discussions between KOICA and University of Dhaka on the project for the establishment of Korean Language Center at the institute of Modern Languages, University of Dhaka, 5.1.1997. Records of KOICA.

3. Record of Discussions of the Project for the construction of a Bangladesh-Korea Friendship Hospital, at Savar, Dhaka. December 19,1994. KOICA Official Record.

4. Records of discussions between the Implementation Survey Team of the Republic of Korea and the Computer Council, Ministry of Science and Information & Communication Technology of the People's Republic of Bangladesh relating to the Project for the establishment of a Center for Advanced Research and Development in Science and Bangladesh-Korea Institute of Information and Communication Technology,29th September,2003.

5. Record of Discussions between the Implementation Survey Team of the Republic of Korea and University of Dhaka, Bangladesh relating to the project for Establishment of Center for Advanced Research and development in Science and Technology at the University of Dhaka, June 28, 2001. in KOICA Official Record.

6. Bangladesh Computer Council, Ministry of Science and Information & Communication Technology, æSouvenir, Inauguration: BCC Bhaban & BKIICT", July 28,2005.pp 24-25.

NGO Reports

æAnnual Report of the Good Neighbors International NGO,2002" (Translated by oh Yeon Keum, KOICA Official).

æAnnual Report of the KDAB, NGO,2005" (Translated by Oh Yeon Keum, KOICA Official).

Interviews by Dr.A.F.M.Shamsur Rahman

Interview of Dr. Chag Hyun-Sik, Managing Director of KOICA, Dated November 29,2006 at the KOICA Building Office, Seoul.

Interview Resources Development Department , KOICA, Dated March 27,2007.

Internet

http://www.mincom.gov.bd/reg_reg_bil_trade.php.

http://www.thedailystar.net/new Design/news-details. php? nid=139126.

http://www.migrationinformation.org/Feture/display.cfm? Id=733

http://www.bdsdf.org/forum/index.php?showtopic=32793.

http://newagebd.com/front.htm/#15

htt://readnpay.blogspot.com/2010/10/07manpower-export-to-s-korea…

http://www.bangladeshnews.com.bd./2007/07/22/manpower-export-to-south-korea-fraud-bd...1/1/1990

http:migration.uedavis.edu/mn/more.php?id=827_0_3-0

http://shafiur.i-edit.net/?p=441

http://www.parapundit.com/archives/001484.html

http://www.kukinews.com/news/articale/view.asp?page=1&g code=kmi&arcid=0920948635&cp=nv

http://www.hancinema.net/korean-movie-Bandhobi.php

http//www.independent-bangladesh.com/2009/02211437/business/s…

http://www.korea-bangla.com/announcement.php1/1/1990

http:asianewsnet.net/home/news.php?id=26121

http:www.studentvisa4u.com/Indian-universities/765.

http://www.mofa.gov.bd/list.pdf.